ইসলাম শিক্ষা

নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ড. মোহাম্মদ ইউসুফ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ধর্মীয় শিক্ষাকে বাস্তব জীবনঘনিষ্ঠ করতে এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে নিজ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও রীতিসমূহের পরিচিতি প্রদান জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নবম-দশম শ্রেণির জন্য **ইসলাম শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় সেসব দিক বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।
পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : আকাইদ ও নৈতিক জীবন	**১-৪০**
ইসলাম	২
ইমান	৪
মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব	৭
তাওহিদ	৯
আল্লাহ তায়ালার পরিচয়	১০
কুফর	১১
শিরক	১৩
নিফাক	১৫
রিসালাত	১৬
নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়ত	২১
আসমানি কিতাব	২৩
নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা	২৭
আখিরাত	২৮
আখিরাতের কয়েকটি স্তর	২৯
সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা	৩৬
দ্বিতীয় অধ্যায় : শরিয়তের উৎস	**৪১-৯৬**
শরিয়ত	৪১
শরিয়তের প্রথম উৎস : আল-কুরআন	৪৪
আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন	৪৫
মক্কি ও মাদানি সূরা	৪৯
তিলাওয়াত : গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য	৫১
সূরা আশ-শামস	৫৩
সূরা আদ-দুহা	৫৬
সূরা আল-ইনশিরাহ	৬০
সূরা আত-তীন	৬২
সূরা আল-মাউন	৬৫
শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাহ	৬৭
হাদিস ১ (শিরক সম্পর্কিত হাদিস)	৭১
হাদিস ২ (ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কিত হাদিস)	৭৩
হাদিস ৩ (দানশীলতা সম্পর্কিত হাদিস)	৭৪
হাদিস ৪ (বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস)	৭৫
হাদিস ৫ (সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদিস)	৭৭
হাদিস ৬ (মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিস)	৭৮
হাদিস ৭ (পরোপকার সম্পর্কিত হাদিস)	৭৯
হাদিস ৮ (বাক্যালাপে সতর্কতা সম্পর্কিত হাদিস)	৮১
হাদিস ৯ (ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিস)	৮২
হাদিস ১০ (যিকির সম্পর্কিত হাদিস)	৮৪
শরিয়তের তৃতীয় উৎস : আল-ইজমা	৮৫
শরিয়তের চতুর্থ উৎস : আল-কিয়াস	৮৭
শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা	৮৯
তৃতীয় অধ্যায় : ইবাদত	**৯৭-১২৪**
ইবাদত	৯৭
সালাত	১০০
সাওম	১০২
যাকাত	১০৪
হজ	১০৬
মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক	১১০
ইলম (জ্ঞান)	১১২
শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য	১১৪
শিক্ষকের গুণাবলি	১১৫
ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক	১১৬
শিক্ষা ও নৈতিকতা	১১৭
জিহাদ	১১৯
জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ	১২১
চতুর্থ অধ্যায় : আখলাক	**১২৫-১৭২**
আখলাকে হামিদাহ	১২৬
তাকওয়া	১২৮
ওয়াদা পালন	১৩০
সত্যবাদিতা	১৩১
শালীনতা	১৩৩
আমানত	১৩৫
মানবসেবা	১৩৭
ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	১৩৯
নারীর প্রতি সম্মানবোধ	১৪২
স্বদেশপ্রেম	১৪৬
কর্তব্যপরায়ণতা	১৪৭
পরিচ্ছন্নতা	১৪৯
মিতব্যয়িতা	১৫১
আত্মশুদ্ধি	১৫৩
সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ	১৫৫
আখলাকে যামিমাহ	১৫৮
প্রতারণা	১৫৯
গিবত	১৬০
হিংসা	১৬২
ফিতনা-ফাসাদ	১৬৩
কর্মবিমুখতা	১৬৫
সুদ ও ঘুষ	১৬৭
পঞ্চম অধ্যায় : আদর্শ জীবনচরিত	**১৭৩-২০০**
মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	১৭৪
মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর	১৭৫
হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যৌবনকাল, নবুয়তপ্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার	১৭৬
হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাদানি জীবন	১৭৮
হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ	১৮০
খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনাদর্শ : হযরত আবু বকর (রা.)	১৮২
হযরত উমর (রা.)	১৮৩
হযরত উসমান (রা.)	১৮৫
হযরত আলি (রা.)	১৮৬
মুসলিম মনীষী : ইমাম বুখারি (র.)	১৮৮
ইমাম আবু হানিফা (র.)	১৮৯
ইমাম গাযালি (র.)	১৯১
ইবনে জারির আত-তাবারি (র.)	১৯১
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মুসলমানদের অবদান।	
চিকিৎসা শাস্ত্র	১৯২
রসায়ন শাস্ত্র	১৯৪
ভূগোল শাস্ত্র	১৯৫
গণিত শাস্ত্র	১৯৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ধ্বংস, ইহকালের সব প্রয়োজনীয় বিষয়, মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সবকিছুই সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা ইসলামে আলোচনা করা হয়নি। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো আমরা জানতে পারব। এজন্য ইসলাম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলাম শিক্ষার পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ায় একটি পুস্তক বা একটি শ্রেণিতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করা খুবই দুরূহ। এ শ্রেণিতে আকাইদ ও নৈতিক জীবন, শরিয়তের উৎস, ইবাদত, আখলাক ও আদর্শ জীবনচরিত শিরোনামে পাঁচটি অধ্যায়ে ইসলামের সুন্দর আদর্শ ও শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ ও নৈতিক জীবন

পরিচয়

আকাইদ শব্দটি আকিদা (عَقِيْدَةٌ) শব্দের বহুবচন। আকাইদ অর্থ বিশ্বাসমালা। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকেই আকাইদ বলা হয়। ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা। এর দুটি দিক রয়েছে। যথা- বিশ্বাসগত দিক ও আচরণগত বা প্রায়োগিক দিক। ইসলামের বিশ্বাসগত দিকের নামই হলো আকাইদ। আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আকাইদের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। মুসলিম হতে হলে সবাইকে এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। এরপর নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি প্রায়োগিক দিক তথা ইবাদত পালন করতে হয়। বস্তুত আকাইদের বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। এজন্য ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই আকাইদ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসমালার কতিপয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- ইসলামের পরিচয় ও ইসলাম শিক্ষা পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক এবং ঈমানের মৌলিক সাতটি বিষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি আস্থা স্থাপনে ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব;
- মহান আল্লাহর পরিচয় ও তাওহিদে বিশ্বাসের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- তাওহিদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- কুফর, শিরক ও নিফাকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং এগুলোর পরিণতি জানতে পারব;
- বাস্তবজীবনে কুফর, শিরক ও নিফাক পরিহার করে চলতে পারব;
- মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ঈমানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;

- রিসালাত ও নবুয়তের ধারণা এবং নবি-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব;
- নবি-রাসুলগণের গুণাবলি, তাঁদের আগমনের ধারা, নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খতমে নবুয়তের ধারণা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে নিজের জীবনে রিসালাতের শিক্ষা বাস্তবায়নে আগ্রহী হব;
- আসমানি কিতাবের পরিচয় ও তৎপ্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পরমতসহিষ্ণুতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আসমানি কিতাবসমূহ ও কুরআন মজিদের পরিচয় জানব, বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে কুরআন পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ হব;
- আখিরাতের ধারণা ও বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- আখিরাতের জীবনের স্তরসমূহ- মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, বিচার, মিযান, পুলসিরাত, শাফাআত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয়, জান্নাত ও জাহান্নামের নাম, জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আখিরাতে বিশ্বাস ও এর তাৎপর্য অনুধাবন করে পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল, নীতিবান, মানবহিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত হব।

পাঠ ১

ইসলাম

পরিচয়

ইসলাম (اَلْإِسْلَامُ) আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ হলো আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহ্ তায়ালা ও রাসুল (স.)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে।

শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা এবং তাঁর দেওয়া বিধান ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেখানো পথ অনুসারে জীবনযাপন করাকে ইসলাম বলা হয়।

একটি হাদিসে মহানবি (স.) সুন্দরভাবে ইসলামের মূল পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন-

اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

অর্থ: "ইসলাম হলো– তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল। সালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ আদায় করবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। এসব আদেশ-নিষেধ শরিয়ত হিসেবে প্রদান করেছেন। শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ইসলাম। এটি হলো মানবজাতির জন্য নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন-

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯)

সুতরাং ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য জীবনবিধান। আর যিনি ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান।

ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার প্রবর্তিত ধর্ম বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এটি মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নিয়ামত। মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের দিকনির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম; আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ই ইসলামে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের অবস্থার বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের বিকল্প নেই।

ইসলাম শব্দটি سِلْمٌ (সিলমুন) মূলধাতু হতে নির্গত, সিলমুন অর্থ শান্তি। ইসলাম মানুষকে শান্তির পথে পরিচালনা করে। ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারে। এজন্য ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়।

ইসলাম সর্বজনীন জীবনবিধান। এটি কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ সে সব ধর্মের প্রবর্তক, প্রচারক, অনুসারী কিংবা জাতির নামে করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম সর্বজনীন জীবনবিধান হওয়ার কারণে এর নামকরণ কারও নামে করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তির পথে জীবন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এর নামকরণ করা হয়েছে ইসলাম।

ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম শিক্ষা হলো ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কোনো কিছু বাস্তবায়ন করতে হলে প্রথমে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। যেমন সাঁতার কাটতে হলে প্রথমে সাঁতার কী, কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় ইত্যাদি শিখতে হয়। গাড়ি চালাতে হলে গাড়ি ও গাড়ি চালনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ঠিক তেমনি ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর এর প্রধান মাধ্যম হলো ইসলাম শিক্ষা।

ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য শিখতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, উঠাবসা কীভাবে করতে হবে তা জানতে পারি। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করতে পারি। লোভ, হিংসা, মিথ্যাচার, অহংকার, পরনিন্দা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস পরিহার করে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারি। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারি। পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় জানতে পারি। এককথায় ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা অর্জন করতে পারি।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা ইসলামের পরিচয়, ভূমিকা ও ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ১৫টি বাক্য বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণি-শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২
ইমান

পরিচয়

ইমান (إِيْمَانٌ) শব্দটি আমনুন (أَمْنٌ) মূল ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ- বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন, স্বীকৃতি দেওয়া, নির্ভর করা, মেনে নেওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে। ইমানের পরিচয় সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

অর্থ: ইমান হচ্ছে, "আল্লাহ, তার ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের (ভালো-মন্দ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।" (মুসলিম)

২০২১

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসকেই বলা হয় ইমান। ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো আল্লাহর বাণী আল-কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র হাদিসে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমানে মুফাস্সালে ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো একত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ-

অর্থ: "আমি ইমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাগণের প্রতি, তার কিতাবগুলোর প্রতি, তার রাসুলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, তকদিরের প্রতি যার ভালো-মন্দ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট থেকেই হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।"

বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ব্যতীত ইমানদার হওয়া যায় না। যিনি এগুলোতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাকে বলা হয় মুমিন।

ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক

ইমান ও ইসলাম দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলা হয়। অন্যদিকে ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ইত্যাদি। মহান আল্লাহর যাবতীয় আদেশ নিষেধ বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তার প্রতি পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মসমর্পণ করার নাম হলো ইসলাম।

ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটি ব্যতীত অন্যটি কল্পনাও করা যায় না। এদের একটি অপরটির উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা না থাকলে মূল বা শিকড় মূল্যহীন। তদ্রূপ ইমান ও ইসলাম একটি অন্যটি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। ইমান মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা সৃষ্টি করে। আর তাতে ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে সজীব ও সতেজ হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয় ইসলাম। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- আল্লাহ্, রাসুল, ফেরেশতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করা হলো ইমান। আর সালাত, যাকাত, হজ ইত্যাদি বিষয় পালন করা হলো ইসলাম।

প্রকৃতপক্ষে, ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে হলে ইমান ও ইসলাম উভয়টিকেই পরিপূর্ণভাবে স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ইমানের সাতটি মূল বিষয়

ইমান অর্থ বিশ্বাস। একজন মুসলিমকে ইমানের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয়। এগুলো আল- কুরআন ও হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ বিষয়গুলোতে বিশ্বাস ব্যতীত কেউই মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। এরূপ বিষয় মোট ৭টি। এগুলো হলো-

১. আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ্ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ বা মাবুদ নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও

রক্ষাকর্তা। তিনি সকল গুণের আধার। তার সত্তা ও গুণাবলি তুলনাহীন। সমস্ত প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তারই জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি এরূপ বিশ্বাস স্থাপন ইমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা সবসময় আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত ও হুকুম পালনে নিয়োজিত। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁরা নারীও নন, পুরুষও নন। তাঁরা পানাহার ও জৈবিক চাহিদা থেকে মুক্ত। তাঁদের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা ইমানের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আসমানি কিতাবসমূহ আল্লাহ্ তায়ালার বাণী। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে নিজ পরিচয় প্রদান করেছেন। নানা আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, সুসংবাদ, সতর্কবাণী ইত্যাদিও এগুলোর মাধ্যমেই এসেছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসুলগণের নিকট এসব কিতাব পাঠিয়েছেন। দুনিয়াতে সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাযিল করা হয়েছে। এ সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক।

৪. নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত বান্দা। সকল সৃষ্টির মধ্যে তাঁরাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে তাঁরা মানব জাতিকে মহান আল্লাহর পথে ডেকেছেন, সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন, ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। নবি-রাসুলগণের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৫. আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাত হলো পরকাল। আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। সেখানে মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাত জীবনের এক একটি পর্যায়। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে মানুষ জান্নাত লাভ করবে। আর ইমান না আনলে, অসৎ কাজ করলে মানুষের স্থান হবে ভীষণ আযাবের স্থান জাহান্নাম।

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

৬. তকদিরে বিশ্বাস

তকদির অর্থ হলো নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের তকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তকদিরের ভালোমন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ যা চায় তা-ই সে করতে পারবে না। বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কোনো কিছু না পায় তবে হতাশ হবে না। আর যদি পেয়ে যায় তবুও খুশিতে আত্মহারা হবে না। বরং সবর (ধৈর্য) ধারণ করবে ও শোকর (কৃতজ্ঞতা) আদায় করবে। আর তকদিরের ভালোমন্দ একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার হাতে, মনেপ্রাণে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস

মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায় না। বরং মানবজীবন দুইভাগে বিভক্ত : ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর পরকাল হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করবেন। সে সময় সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। আল্লাহ তায়ালা সেদিন বিচারক হিসেবে মানুষের সকল কাজের হিসাব নেবেন। অতঃপর মানুষকে তার ভালো কাজের জন্য পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতে ও মন্দ কাজের শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সুতরাং মৃত্যুর পর আমরা সবাই পুনরায় জীবিত হব এ বিশ্বাস রাখা ইমানের অপরিহার্য বিষয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক বিষয়ে পাঁচটি বাক্য শ্রেণিকক্ষে বসে নিজ খাতায় লিখবে।

পাঠ-৩
মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব

ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই সাধারণত ইমান বলা হয়। আর মানবিক বলতে মানব সম্বন্ধীয় বুঝায়। অর্থাৎ যেসব বিষয় একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাই মানবিক মূল্যবোধ। অন্যকথায় যেসব কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা মানুষ ও মানব সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই মানবিক মূল্যবোধ।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। এ হিসেবে মানুষের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ড সবই উন্নত ও সর্বোত্তম হওয়া উচিত। পশুর ন্যায় কাজকর্ম, লোভ-লালসা ইত্যাদি মানবিকতার আদর্শ নয়। যদি কোনো মানুষ এ আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে পশুর ন্যায় আচরণ করে তবে সে মানবিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে। মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত রাখার জন্য উত্তম গুণাবলি ও আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করা যায়।

মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমান নানাভাবে মানুষের মানবিকতার বিকাশ সাধন করে থাকে। ইমানের মূলকথা হলো-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)। অর্থ : "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল।" এ কালিমার তাৎপর্য হলো আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও মাবুদ। তিনি ব্যতীত প্রশংসা ও ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি ব্যতীত আর কারও সামনে মাথা নত করা যাবে না। এ কালিমা মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে। এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথা নত করে। পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে না বা আত্মসমর্পণ করে না। ফলে মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়, মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়।

ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে। নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়। অন্যায় অত্যাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপ ইমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ণাঙ্গ মুমিন ব্যক্তি কখনোই মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিপরীত কাজ করতে পারে না। বরং মুমিন ব্যক্তি সবসময়ই নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলির চর্চা করে।

কুফর, নিফাক, শিরক ইত্যাদি ইমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ সমস্ত বিষয় মানুষের মধ্যে অসৎ কার্যাবলির বিকাশ ঘটায়। এগুলোর প্রভাবে মানবসমাজে অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বাস, মিথ্যাচার, ওয়াদা খেলাপ, ঝগড়া-ফাসাদ, বিদ্রোহ ইত্যাদি জন্ম নেয়। যেমন মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝

অর্থ : "আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ০১)

ইমান মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। মন্দ অভ্যাস ও অশ্লীল কার্যাবলি থেকে বিরত রাখে। ইমান মানুষকে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করে। মুমিন ব্যক্তি সবসময় মনে রাখেন যে, তাঁকে একদিন আল্লাহ তায়ালার সামনে হাজির হতে হবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালা সব কাজকর্মের হিসাব চাইবেন। অতএব এ জবাবদিহির ভয়ে মুমিন ব্যক্তি সব ধরনের অমানবিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকে। নিশ্চয়ই জান্নাতই হলো তার বাসস্থান।" (সূরা আন-নাযিয়াত, আয়াত ৪০-৪১)

মানবিক মূল্যবোধ ও ইমান পারস্পরিক গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিন হয়ে ওঠে। জীবনযাপনে সে নিজ খেয়ালখুশির পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনার অনুসারী হয়। ফলে সে সবধরনের অন্যায়, অবিচার ও অনৈতিকতা বাদ দিয়ে সুন্দর ও উত্তম আদর্শের অনুশীলন করে থাকে। এভাবে ইমান মানুষের মধ্যে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে সব ছাত্র/ছাত্রী আলোচনা করে তিনজনকে বাছাই করবে। এ তিনজন 'মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব' বিষয়ে কী শিক্ষা লাভ করল তা বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। শ্রেণির সব শিক্ষার্থী শ্রোতা হিসেবে শুনবে। শিক্ষক সভাপতি ও সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনজন বক্তার মধ্যে সবচেয়ে যে ভালো বক্তৃতা প্রদান করবে তাকে সবাই শুভেচ্ছা জানাবে।

পাঠ-৪
তাওহিদ

পরিচয়

তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়।

তাওহিদের মূল কথা হলো- আল্লাহ্ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। তিনিই প্রশংসা ও ইবাদতের একমাত্র মালিক। তাঁর তুলনীয় কেউ নেই। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

অর্থ: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।" (সূরা আশ্-শুরা, আয়াত ১১)

আল্লাহ্ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ।

তাওহিদের গুরুত্ব

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। অর্থাৎ মুমিন বা মুসলিম হতে হলে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস করতে হবে। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই ইমান বা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের সকল শিক্ষা ও আদর্শই তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়াতে যত নবি-রাসুল এসেছেন সকলেই তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। সকলের দাওয়াতের মূলকথা ছিল- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাওহিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য নবি-রাসুলগণ আজীবন সংগ্রাম করেছেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন। বস্তুত, তাওহিদই হলো ইমানের মূল। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওহিদের প্রভাব

তাওহিদ হলো আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস। মানব জীবনে এ বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। কেননা আল্লাহ্ তায়ালাই আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়। মানুষ এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে। মানুষ আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারও নিকট মাথা নত করে না। ফলে জগতের সকল সৃষ্টির উপর মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

সৎচরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রেও মানবজীবনে তাওহিদের প্রভাব অপরিসীম। মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলি ও পরিচয় লাভ করে এবং সেসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার অনুশীলন করে। মানব সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায়ও তাওহিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা তাওহিদে বিশ্বাস মানব সমাজে এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যে, সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও সমান মর্যাদার অধিকারী। এভাবে মানুষের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত হয়।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষ সৎকর্মে ব্রতী হয়। অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে মানব সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাওহিদে বিশ্বাস পরকালীন জীবনে মানুষকে সফলতা দান করে। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বস্তুত মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাওহিদে বিশ্বাস মুক্তি ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা তাওহিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে নিজের অর্জিত ধারণা শিক্ষকের নিকট মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক তা মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ-৫

আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয়

আল্লাহ্ তায়ালা এ বিশ্বজগতের অধিপতি ও মালিক। তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তার কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্য ও অতুলনীয়।

'আল্লাহ' শব্দের মধ্যেই তার তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। اَللّٰهُ (আল্লাহ) আরবি শব্দ। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই এ শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। এর কোনো একবচন-বহুবচন নেই। এ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ নেই। এ শব্দটি একক ও অতুলনীয়। আল্লাহ্ তায়ালাও তদ্রূপ। তিনি তার সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অদ্বিতীয়। তার সমতুল্য বা সমকক্ষ কিছুই নেই। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

অর্থ : "বলুন (হে নবি!) তিনিই আল্লাহ। একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তার সমতুল্য কেউই নেই।" (সুরা আল-ইখলাস, আয়াত ১-৪)

আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরবিরাজমান। তার কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি পানাহার, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি সবকিছু থেকে মুক্ত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

অর্থ : "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (সুরা আল- হাদিদ, আয়াত ৩)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ

অর্থ : "তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক। তন্দ্রা বা নিদ্রা তাকে কখনোই স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তার অধীন।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

আল্লাহ্‌ তায়ালা সকল গুণের আধার। সকল গুণ তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি সৃষ্টিকর্তা। বিশ্বজগৎ ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তার সৃষ্টি। তিনি রিযিকদাতা। সকল সৃষ্টিই রিযিকের জন্য তার মুখাপেক্ষী। তিনিই সর্বশক্তিমান সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সকল কিছুই তার পরিচালনায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এককথায় তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। তার গুণের কোনো সীমা নেই। সুন্দর ও পবিত্র নামসমূহ একমাত্র তারই জন্য নির্ধারিত। তার কতিপয় গুণবাচক নাম হলো- রহিম (অসীম দয়ালু), জাব্বার (প্রবল), গাফফার (অতি ক্ষমাশীল), বাসির (সর্বদ্রষ্টা), সামিউ (সর্বশ্রোতা), আলিউ (মহান), হাফিয (মহারক্ষক) ইত্যাদি।

বস্তুত আল্লাহ্‌ তায়ালা তার সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অতুলনীয়। তার কোনো শরিক নেই। সকল প্রশংসা তারই জন্য, ইবাদতের যোগ্য সত্তা একমাত্র তিনিই।

পাঠ-৬

কুফর

পরিচয়

কুফর (اَلْكُفْرُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, ঢেকে রাখা, গোপন করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ্‌ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়।

কুফর হলো- ইমানের বিপরীত। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাসের নাম ইমান। আর এসব বিষয়ে অবিশ্বাস করা হলো কুফর।

কাফির

যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় কাফির। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয়ে অবিশ্বাস করে তখন তাকে কাফির বলা হয়। কাফির অর্থ অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী। মানুষ নানাভাবে কাফির বা অবিশ্বাসী হতে পারে। যেমন:

ক. আল্লাহ্‌ তায়ালার অস্তিত্ব অবিশ্বাস বা অস্বীকার করার দ্বারা। অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌ নেই' এমন কথা বললে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

খ. আল্লাহ্‌ তায়ালার গুণাবলি অস্বীকার করা। যেমন- আল্লাহ্‌ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা বা রিজিকদাতা না মানা।

গ. ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়ের যে কোন একটিকেও অবিশ্বাস করা। যেমন- ফেরেশতা, নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তকদির ইত্যাদি অবিশ্বাস করা।

ঘ. ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অস্বীকার করা। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদিকে ইবাদত হিসেবে না মানা।

ঙ. হালালকে হারাম মনে করা। যেমন- হালাল খাদ্যকে হারাম মনে করে না খাওয়া।

চ. হারামকে হালাল মনে করা। যেমন- মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিকে হালাল বা জায়েজ মনে করা।

ছ. ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের (শ্রেষ্ঠ মনে করে তাদের) অনুকরণ করা ও তাদের ধর্মীয় চিহ্ন ব্যবহার করা।

জ. ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। যেমন, মহানবি (স.) কিংবা কুরআনকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা।

উপরোল্লিখিত কাজগুলো করার মাধ্যমে মানুষ কাফির হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পুনরায় ঈমান আনতে ও খাঁটি মনে তওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ ঘৃণ্য কাজ না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

কুফরের পরিণতি ও কুফল

মানবজীবনে কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয় বরং আখিরাতেও মানুষকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হবে। এর কতিপয় কুফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা

কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই আমাদের লালন-পালন করেন। পৃথিবীর সকল নিয়ামত তারই দান। কাফির ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালাকে অবিশ্বাস করে, এসব নিয়ামত অস্বীকার করে। সে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহ্ তায়ালার বিধি-নিষেধ অমান্য করে। ফলে সমাজে সে অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হয়।

খ. পাপাচার বৃদ্ধি

কাফির ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা, পরকাল, হাশর, মিযান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি অবিশ্বাস করে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মানুষকে তার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এরূপ ধারণাও অস্বীকার করে। তার নিকট দুনিয়ার জীবনই প্রধান। সুতরাং দুনিয়ায় ধন-সম্পদের ও আরাম-আয়েশের লোভে সে নানারকম অসৎ ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, সুদ-ঘুষ, জুয়া ইত্যাদিতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি পায়।

গ. হতাশা সৃষ্টি

স্বভাবগতভাবেই মানুষ ভরসা করতে পছন্দ করে। আশা-ভরসা না থাকলে মানুষ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। কাফির ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা ও তকদিরে অবিশ্বাস করে। ফলে সে যেকোনো বিপদে আপদে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্যধারণ করতে পারে না। অন্যদিকে তকদিরে বিশ্বাস না থাকায় যেকোনো ব্যর্থতায় সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তার জীবন চরম হতাশাগ্রস্তভাবে অতিবাহিত হয়।

ঘ. অনৈতিকতার প্রসার

কুফর মানবসমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস না থাকায় কাফির ব্যক্তি নৈতিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং দুনিয়ার স্বার্থে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি যেকোনো পাপ ও অনৈতিক কাজই সে বিনা দ্বিধায় করতে পারে। নবি-রাসুলগণকে বিশ্বাস না করায় তাঁদের নৈতিক চরিত্র এবং শিক্ষাও সে অনুসরণ করে না। এভাবে কুফরের মাধ্যমে সমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটে।

ঙ. আল্লাহ্ তায়ালার অসন্তুষ্টি

কুফরির মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। কাফির আল্লাহ্ তায়ালার বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধের কোনো পরোয়া করে না। বরং আল্লাহ্ তায়ালা, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিদ্রোহ ও বিরোধিতা করে। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর যার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন, সে যত ক্ষমতা ও সম্পদের মালিক হোক না কেন তার ধ্বংস অনিবার্য।

চ. অনন্তকালের শাস্তি

পরকালে কাফিররা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অর্থ : "আর যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)

কুফর একটি মারাত্মক পাপ। সুতরাং এ থেকে সকলেরই বেঁচে থাকা উচিত।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা কুফরের পরিণতি ও কুফল সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ-৭
শিরক

পরিচয়

শিরক (اَلشِّرْكُ) শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং শিরকের ধারণা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

অর্থ : "বলুন (হে নবি!) তিনি আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়।" (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ১)। অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ

অর্থ : "কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়।" (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ১১)। আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে-

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ

অর্থ : "যদি সেখানে (আসমান ও জমিনে) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ২২)

আল-কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ও গুণে অতুলনীয়তার বিষয়টি বোঝা যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার করা নিঃসন্দেহে শিরক ও জঘন্য অপরাধ।

আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক চার ধরনের হতে পারে। যথা-

১. আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা। যেমন- ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করা।

২. আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করা। যেমন- আল্লাহ্ তায়ালার পাশাপাশি অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা বা রিজিকদাতা মনে করা।

৩. সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো। যেমন- ফেরেশতাদের জগৎ পরিচালনাকারী হিসেবে মনে করা।

৪. ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। যেমন- আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ্ করা, কারও নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি।

শিরকের কুফল ও প্রতিকার

শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো শিরক। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)

বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালাই আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতই আমরা ভোগ করি। এরপরও কেউ যদি আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে তবে তা অপেক্ষা বড় জুলুম আর কি হতে পারে?

আল্লাহ্ তায়ালা মুশরিকদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪৮)

বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালার দয়া, ক্ষমা ও রহমত ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। পরকালে মুশরিকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ্ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দেবেন। এবং তার আবাস জাহান্নাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৭২)

প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এরূপ কাজ থেকে সকলেরই সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ভুলক্রমে আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করে ফেললে সাথে সাথে পুনরায় ইমান আনতে হবে। অতঃপর বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সাথে সাথে ভবিষ্যতে এরূপ পাপ না করার শপথ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দয়া ও করুণার মাধ্যমে পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

আমরা অবশ্যই শিরক থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহর উপর সুদৃঢ় ইমান এনে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হব। তাহলেই আমাদের ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলময় হবে।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা শিরকের পরিচয়, কুফল ও প্রতিকার বিষয়ে ১০টি বাক্য বাড়ি থেকে পোস্টার আকারে তৈরি করে নিয়ে আসবে।

পাঠ-৮
নিফাক

পরিচয়

নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ ভণ্ডামি, কপটতা, দ্বিমুখীভাব, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। এর ব্যবহারিক অর্থ হলো অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে এর বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করা। অর্থাৎ অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলামকে স্বীকার করার নাম হলো নিফাক। যে এরূপ কাজ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিকরা অন্তরের দিক থেকে কাফির ও অবাধ্য। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তারা ইসলাম ও ইমান স্বীকার করে এবং মুসলিমদের ন্যায় ইবাদত পালন করে।

রাসুলুল্লাহ (স.) মুনাফিকদের চিহ্ন বর্ণনা করে বলেছেন-

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ- إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

অর্থ : "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে।" (সহিহ্ বুখারি)

নিফাকের কুফল ও প্রতিকার

নিফাক একটি মারাত্মক পাপ। এটি মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ○

অর্থ : "আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।" (সুরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ০১)

মিথ্যার পাশাপাশি মুনাফিকরা অন্যান্য খারাপ ও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা মানুষের অকল্যাণ করতেও পিছপা হয় না। তারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে। ফলে সমাজে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মুনাফিকরা ভেতরে এক আর বাইরে অন্য রকম হওয়ায় লোকজন তাদের বিশ্বাস করে না। বরং সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখে। সমাজের মানুষের নিকট তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কাটায়।

ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা খুবই ক্ষতিকর। কেননা তারা মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করে। মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বলতার কথা শত্রুদের জানিয়ে দেয়। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর যুগেও মদিনাতে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

তারা ইসলাম ও মুসলমানগণের সাথে থেকেও আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য ছিল। পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)

আমরা নিফাক থেকে বেঁচে থাকব। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের নিকট নিফাকের কুফল ও পরিণতির কথা তুলে ধরব ও তাদের সতর্ক করব। রাসুলুল্লাহ (স.) মুনাফিকদের যে তিনটি চিহ্ন বা নিদর্শনের কথা বলেছেন এগুলো থেকে আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকব এবং নিজ জীবনে উত্তম চরিত্র অনুশীলন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাফিকের চিহ্নগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ৯

রিসালাত

পরিচয়

রিসালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বার্তা, চিঠি পৌঁছানো, পয়গাম, সংবাদ বা কোনো ভালো কাজের দায়িত্ব বহন করা। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়। আর যিনি এ দায়িত্ব পালন করেন তাঁকে বলা হয় রাসুল। রাসুল শব্দের বহুবচন রুসুল।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

ইসলামি জীবনদর্শনে রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। তাওহিদে বিশ্বাসের সাথে সাথে প্রত্যেক মুমিন ও মুসলিমকেই রিসালাতে বিশ্বাস করতে হয়। ইসলামের মূলবাণী কালিমা তায়্যিবাতে এ বিষয়টি

সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। এ কালিমার প্রথমাংশ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ: অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই) দ্বারা তাওহিদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর সাথে সাথে দ্বিতীয়াংশে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ: অর্থ- মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল) দ্বারা রিসালাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপনের ন্যায় রিসালাতেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

বস্তুত রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এ স্বল্প জ্ঞান দ্বারা অনন্ত, অসীম আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই নবি-রাসুলগণ মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও গুণাবলির বর্ণনা প্রদান করেছেন। তাঁরা ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা নিয়ে এসেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) না আসলে নবি ও রাসুল সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। এমনকি আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও সিফাতের পরিচয়ও লাভ করতে পারতাম না। মূলত নবি-রাসুলগণের আনীত বাণী ও বর্ণনার ফলেই মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং নবি-রাসুলগণের এ সমস্ত সংবাদ বা রিসালাতকে বিশ্বাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, রিসালাতকে অস্বীকার করলে মহান আল্লাহকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হয়। অতএব, মানবজীবনে রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে নির্ধারিত।

নবি-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য-অগণিত নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যহীনভাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়নি বরং তাঁরা নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদের বেশ কিছু কাজ করতে হতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় কাজ হলো-

- তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জাত-সিফাত, ক্ষমতা, নিয়ামত ইত্যাদি বিষয়ের কথা মানুষের নিকট প্রকাশ করতেন।
- সত্য ও সুন্দর জীবনের দিকে আহবান জানাতেন।
- আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও ধর্মীয় নানা বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।
- পরকাল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতেন।
- পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্য হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন।

নবি-রাসুলগণের গুণাবলি

নবি-রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

অর্থ : "আল্লাহ তায়ালাই ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকেও রাসুল মনোনীত করেন; আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৭৫)

সুতরাং মনোনীত বান্দা হিসেবে নবি-রাসুলগণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত, তাঁরা ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাসী। সবধরনের কথায় ও কাজে তাঁরা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অনুসরণ করতেন। আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্যই ছিল তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নবি-রাসুলগণ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সুবিবেচক ও বিচক্ষণ। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁরা সবধরনের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকল প্রকার অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ নবি। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি তাঁকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ২৪)

নবি-রাসুলগণ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সকল সৎগুণ তাঁরা অনুশীলন করতেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সৎ, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ। দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য ইত্যাদি সব ধরনের মানবিক গুণ তাঁদের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। মিথ্যা, প্রতারণা, পরনিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি খারাপ স্বভাবের লেশমাত্র তাঁদের চরিত্রে কখনোই ছিল না। বরং তাঁরা ছিলেন সৎস্বভাবের জন্য মানবজাতির অনুপম আদর্শ।

কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বপালনে নবি-রাসুলগণ ছিলেন অতুলনীয়। নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা বিন্দুমাত্র অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেননি। বরং এজন্য কাফিরদের বহু অত্যাচার ও নিপীড়ন ধৈর্যসহকারে সহ্য করেছেন। কিন্তু তারপরও তাঁরা যথাযথভাবে মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ। পার্থিব কোনো লাভের আশায় তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব থেকে কখনো পিছপা হননি। কাফিররা ইসলামের দাওয়াত প্রচার বন্ধ করার জন্য তাঁদের নানা প্রলোভন দেখাত। কিন্তু তাঁরা পার্থিব স্বার্থের কাছে মাথা নত করেননি।

দীন প্রচারে নবি-রাসুলগণ ছিলেন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। বিনা দ্বিধায় পার্থিব আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ তাঁরা আল্লাহর নির্দেশে ত্যাগ করতেন। দীন প্রচারের স্বার্থে প্রিয়নবি (স.) বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি নিজ দেশ মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। নবি-রাসুলগণের জীবনীতে ত্যাগের এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

নবুয়তের ধারা

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.), আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। এঁদের মাঝখানে আল্লাহ তায়ালা আরও বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলদের আগমনের এই ধারাবাহিকতাকেই নবুয়তের ক্রমধারা বলা হয়। দুনিয়াতে আগত সকল গোষ্ঠী বা জাতির জন্যই আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুল বা পথপ্রদর্শনকারী পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

অর্থ : "আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথপ্রদর্শক রয়েছে।" (সূরা আর-রাদ, আয়াত ৭)

তাঁরা মানুষকে এক আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকতেন। সত্য ও সুন্দর জীবনবিধান তথা আল্লাহর দীন অনুসরণের নির্দেশ দিতেন।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শরিয়ত তথা দীনের বিধি-বিধান এক রকম ছিল না। বরং মানবজাতির পরিবেশ, পরিস্থিতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন শরিয়ত দেওয়া হতো। নবি-রাসুলগণ তা মানবসমাজে বাস্তবায়ন করতেন। তবে সব নবি-রাসুলের দীনের মৌলিক কাঠামো ছিল এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ বা তাওহিদ ছিল সবারই প্রচারিত দীনের মূলকথা। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আগত সকল নবি-রাসুলই এ দীন প্রচার করেছেন। হযরত নুহ (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত ঈসা (আ.) সকলেই এই একই দীন ও শিক্ষা প্রচার করেছেন। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন নবুয়তের ধারার সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসেননি, আসবেনও না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

এভাবে দ্বীনের বিধি-বিধান পূর্ণতা প্রাপ্তির ফলে নবি-রাসুলগণের আগমনের ধারাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নবুয়তের ধারাও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। মানুষের হিদায়াতের জন্য আগমনকারী এসব নবি-রাসুল সকলেই ছিলেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। তাঁদের সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟

অর্থ : "রাসুল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তাদের সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসুলগণে ইমান এনেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৫)

নবুয়তের ধারায় আগমনকারী সব নবি-রাসুলকে বিশ্বাস করা ইমানের অপরিহার্য শর্ত। এঁদের কাউকে বিশ্বাস এবং কাউকে অবিশ্বাস করা যাবে না। বরং সকলকেই আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি-রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। নবি-রাসুল হিসেবে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। কারও প্রতিই কোনোরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করা যাবে না।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি

নবুয়তের ধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ছিলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দুনিয়াতে আগমনকারী সব নবি-রাসুলই কোনো বিশেষ গোত্র, বিশেষ দেশ, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সারা বিশ্বের সকল স্থানের সকল মানুষের নবি। তিনি বিশ্বনবি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থ : "(হে নবি!) আপনি বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহর রাসুল হিসেবে প্রেরিত।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৫৮)

রাসুলুল্লাহ (স.) ছিলেন সর্বকালের নবি। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমন করবে সকলের নবি তিনিই। তাঁর শিক্ষা, আদর্শ ও আনীত কিতাব আল-কুরআন সকলকেই অনুসরণ করতে হবে। তিনি রহমতের নবি। মানবজাতির জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহস্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ۝

অর্থ : "আর (হে নবি!) আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

অতএব, আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হিসেবে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি কর্তব্য।

খতমে নবুয়তের অর্থ ও এতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি-রাসুলগণের ধারায় সর্বশেষে আগমন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' তথা সর্বশেষ নবি বলে অভিহিত করেছেন।

খাতামুন অর্থ শেষ, সমাপ্তি। আর নবুয়ত হলো নবিগণের দায়িত্ব। সুতরাং খতমে নবুয়তের অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে নবি-রাসুলগণের আগমনের ধারা শেষ বা বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তিনিই সর্বশেষ নবি বা খাতামুন নাবিয়্যিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

অর্থ : "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৪০)

খাতামুন শব্দের অন্যতম অর্থ সিলমোহর। কোনো কিছুতে সিলমোহর তখন অঙ্কিত করা হয় যখন তা পূর্ণ হয়ে যায়। সিলমোহর লাগানোর পর তাতে কোনো কিছু প্রবেশ করানো যায় না। নবুয়তের সিলমোহর হলো নবুয়তের পরিসমাপ্তির ঘোষণা। নবুয়তের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা। অর্থাৎ নতুনভাবে কোনো ব্যক্তি নবি হতে পারবে না এবং নবুয়তের ধারায় প্রবেশ করতে পারবে না। এটাই হলো খতমে নবুয়তের মূল কথা।

আমাদের প্রিয় নবি (স.) হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন। তিনি সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর পরে আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি। কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। তাঁর পরবর্তীতে যারা নবুয়ত দাবি করেছে তারা সবাই ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। কেননা মহানবি (স.) বলেছেন,

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

অর্থ : "আমি শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই।" (সহিহ মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন- "অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই নবি হওয়ার দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি আসবে না।" (আবু দাউদ)

হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে খাতামুন নাবিয়্যিন হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। তাঁর পরবর্তীতে যারা নবি বলে দাবি করেছে সবাই মিথ্যাবাদী। আমরা এসব মিথ্যাবাদীকে নবি হিসেবে বিশ্বাস করব না। তাদের শিক্ষা, আদর্শ বর্জন করব।

আমরা জীবনের সর্বাবস্থায় মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে চলব।

কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা রিসালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় লিখবে।
খ. শিক্ষার্থীরা নবি-রাসুলগণের গুণাবলি সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১০

নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়ত

ইসলাম নীতি-নৈতিকতার ধর্ম। ইসলামের সমস্ত আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, শিক্ষা-আদর্শ নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামি জীবনদর্শনে রিসালাত ও নবুয়ত অপরিহার্য বিষয়। নবুয়ত ও রিসালাত হলো নবি-রাসুলগণের দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালার বাণী ও শিক্ষা মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়াকে নবুয়ত ও রিসালাত বলা হয়। মানবজীবনে নৈতিক মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারে নবুয়ত ও রিসালাত প্রধানত দুই ভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথমত, নবুয়ত ও রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব, পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করা। সর্বোপরি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও সফলতার দিকনির্দেশনা প্রদান করা। নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষা মানুষকে শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে পরিচালনা করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সকল কাজকর্ম আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এভাবে দেখা যায়, যে ব্যক্তি নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষানুসারে জীবনযাপন করে সেই পরিপূর্ণ মানুষ। এরূপ ব্যক্তি সমস্ত মানবিক গুণের অধিকারী হয়। পশুত্বের অভ্যাস ত্যাগ করে মনুষ্যত্বের অভ্যাস অনুশীলন করে। নবুয়ত ও রিসালাতের চেতনা মানুষের মধ্যকার সমস্ত খারাপ অভ্যাস, অশ্লীলতা ও মন্দকর্মের চর্চা দূর করে দেয়। মানুষ সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহিত হয়। উত্তম চরিত্র ও নৈতিক আচার-আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষায় মানুষ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, নবুয়ত ও রিসালাত মানুষকে নবি-রাসুলগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। নবি-রাসুলগণ ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন সকল সৎগুণের অধিকারী। উত্তম চরিত্রের নমুনা ছিল তাঁদের জীবনচরিত। কোনোরূপ অন্যায়, অনৈতিক ও অশ্লীল কাজকর্ম তাঁদের চরিত্রে কখনোই ছিল না। বরং সর্বাবস্থায় নীতি ও নৈতিকতার আদর্শ রক্ষা করাই ছিল তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১)

বস্তুত নবি-রাসুলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের জীবনী ও শিক্ষা আমাদের জন্য আদর্শ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। (ইবনে মাজাহ)

রাসুলুল্লাহ (স.) ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। তিনি মানুষকে মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদির নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অত্যাচার, অবিচার ও অনৈতিকতার বদলে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার কথা বলেছেন। মানুষকে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নিজ জীবনে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে হাতে কলমে মানুষকে নৈতিকতা সমুন্নত রাখতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন-

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : "উত্তম গুণাবলির পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (বায়হাকি)

বস্তুত নবি-রাসুলগণ সকলেই ছিলেন উত্তম আদর্শের নমুনা। আর আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাঁর চরিত্রে মানবিক সবগুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

নবুয়ত ও রিসালাতে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা ইসলামি জীবনদর্শনে প্রবেশ করি। অতঃপর নবি-রাসুলগণের জীবনী ও আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ কামনা করি। এভাবে আমাদের জীবন ও চরিত্র উত্তম হয়। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। মানবসমাজে পশুত্বের পরিবর্তে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে ১৫টি বাক্য নিজ খাতায় বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণি-শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১
আসমানি কিতাব

পরিচয়

কিতাব শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ বা লিখিত বস্তু। এর প্রতিশব্দ হলো গ্রন্থ, পুস্তক, বই ইত্যাদি। আসমানি কিতাব হলো এমন গ্রন্থ যা আল্লাহ্ তায়ালা থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায়, যেসব কিতাব আল্লাহ্ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দিকনির্দেশনা স্বরূপ নাজিল করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বলে। অন্যকথায় আল্লাহ্ তায়ালার বাণী সম্বলিত গ্রন্থাবলিকে আসমানি কিতাব বলা হয়। সুতরাং আসমানি কিতাব হলো আল্লাহ্র বাণীসমষ্টি। আল্লাহ্ তায়ালা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বাণী রাসুলগণের নিকট প্রেরণ করেছেন। অতঃপর নবি-রাসুলগণ তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তু

আল্লাহ্ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে নানা বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

ক. আল্লাহ্ তায়ালার সত্তাগত পরিচয়।

খ. আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলির বর্ণনা।

গ. নবি-রাসুলগণের বর্ণনা।

ঘ. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিবরণ।

ঙ. অবাধ্য ও কাফিরদের পরিণতির বিবরণ।

চ. হালাল-হারামের বর্ণনা।

ছ. বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিবরণ।

জ. শাস্তি ও সতর্কীকরণ বিষয়ে আলোচনা।

ঝ. উপদেশ ও সুসংবাদ সম্পর্কে বিবরণ।

ঞ. আকিদা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ।

ট. পরকাল সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাবসমূহ

আল্লাহ্ তায়ালা সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এর মধ্যে ৪ (চার) খানা বড় ও প্রসিদ্ধ এবং ১০০ খানা ছোট কিতাব। ছোট কিতাবগুলোকে সহিফা বলা হয়। বড় চারখানা কিতাব চারজন প্রসিদ্ধ রাসুলের উপর নাজিল হয়। এগুলো হলো-

১. তাওরাত - হযরত মুসা (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে।

২. যাবুর - হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে।

৩. ইঞ্জিল - হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে।

৪. কুরআন - বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাজিল হয়েছে।

আর ১০০ খানা সহিফা মোট চারজন নবির উপর নাজিল হয়। এঁরা হলেন-

১. হযরত আদম (আ.)। তাঁর উপর ১০ খানা সহিফা নাজিল হয়েছে।
২. হযরত শিস (আ.)। তাঁর উপর ৫০ খানা সহিফা নাজিল হয়েছে।
৩. হযরত ইবরাহিম (আ.)। তাঁর উপর ১০ খানা সহিফা নাজিল হয়েছে।
৪. হযরত ইদরিস (আ.)। তাঁর উপর ৩০ খানা সহিফা নাজিল হয়েছে।

আসমানি কিতাবে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন না করলে ইমানের মূল বিষয়ই নড়বড়ে হয়ে যায়। কেননা আসমানি কিতাবগুলোর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। যদি কেউ আসমানি কিতাবসমূহ ও তাতে বর্ণিত বিষয়সমূহে অবিশ্বাস করে তবে স্বভাবতই সে ইমানের অন্যান্য বিষয়গুলোও অস্বীকার করে। সুতরাং ইমান আনার জন্য আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। অন্যথায় পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।

আসমানি কিতাবসমূহ হলো সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস। এর মাধ্যমেই আমরা সৃষ্টিজগৎ, মানবসৃষ্টি, পরকাল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। মানব জীবনে চলার পথ সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা আসমানি কিতাবসমূহেই পাওয়া যায়। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাসই এসব বিষয়কে আমাদের বাস্তবজীবনে অনুশীলনের অনুপ্রেরণা দেয়।

সর্বশেষ আসমানি কিতাব 'আল-কুরআন'

আল-কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী। মানবজাতির হিদায়াতের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এ কিতাব নাজিল করেন। আল-কুরআনই হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

নবি করিম (স.)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাবস্থায় সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত নাজিল হয়। এভাবে পবিত্র কুরআন নাজিল শুরু হয়। অতঃপর রাসুল (স.)-এর নবুয়তের ২৩ বছরে অল্প অল্প করে প্রয়োজন মাফিক সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়।

আল-কুরআন ৩০টি খণ্ডে বিভক্ত। এগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি পারা বলা হয়। এর সূরা সংখ্যা ১১৪টি এবং রুকু সংখ্যা ৫৫৮টি।

কুরআনের নামকরণ

কুরআন অর্থ পঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ মহাগ্রন্থকে কুরআন বলা হয়।

কুরআনের অন্য অর্থ একত্র করা বা জমা করা। আল-কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের শিক্ষা ও মূলনীতি একত্র করা হয়েছে বিধায় একে কুরআন বলা হয়।

আল-কুরআনের বেশকিছু নাম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম-

১. আল-কিতাব (اَلْكِتٰبُ)- গ্রন্থ।

২. আল-ফুরকান (اَلْفُرْقَانُ)- (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী।

৩. আল-হিকমা (اَلْحِكْمَةُ)- জ্ঞান, প্রজ্ঞা।

৪. আল-বুরহান (اَلْبُرْهَانُ)- সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৫. আল-হক (اَلْحَقُّ) - সত্য।

৬. আন-নূর (اَلنُّوْرُ) - জ্যোতি।

৭. আল-হুদা (اَلْهُدٰى) - পথনির্দেশ।

৮. আয-যিকর (اَلذِّكْرُ) - উপদেশ।

৯. আশ-শিফা (اَلشِّفَاءُ)- নিরাময়।

১০. আল-মজিদ (اَلْمَجِيْدُ)- সম্মানিত, মহিমান্বিত।

১১. আল-মাওয়িযা (اَلْمَوْعِظَةُ)- সদুপদেশ।

১২. আর-রাহমাহ (اَلرَّحْمَةُ)- অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি দুনিয়ার সকল গ্রন্থ, এমনকি অন্যান্য আসমানি কিতাবের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর সমকক্ষ আর কোনো কিতাব নেই।

আল-কুরআন পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এ গ্রন্থ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। সব বিষয়ের মূলনীতি এ গ্রন্থে বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : "আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত ৩৮)

সুতরাং আল-কুরআন হলো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের যথাযথ নির্দেশনা এ কিতাবে বিদ্যমান।

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-এর মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ফলে পৃথিবীতে আর কোনো নবি-রাসুল আসবেন না। কোনো আসমানি কিতাবও নাজিল হবে না। কুরআনের শিক্ষাই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাছাড়া পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের সার-নির্যাসও কুরআনে রয়েছে। সুতরাং এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

আল-কুরআন সন্দেহমুক্ত কিতাব। দুনিয়ার কোনো গ্রন্থই নির্ভুল বা অকাট্য নয়। কিন্তু কুরআন নির্ভুল এবং এটি সন্দেহেরও বাইরে। সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে এমন কোনো বিষয়ই এতে নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

অর্থ : "এটি (কুরআন) সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২)

সর্বজনীন কিতাব হিসেবেও আল-কুরআনের মর্যাদা অনন্য। এটি কোনো দেশ, কাল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল যুগের সব মানুষের জন্য এটি উপদেশ ও পথনির্দেশক। সুতরাং এটি সর্বজনীন কিতাব। আল-কুরআন একমাত্র অবিকৃত গ্রন্থ। নাজিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত এর একটি হরকত বা নুকতাও পরিবর্তিত হয়নি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এর রক্ষক। তিনি বলেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

অর্থ : "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

বস্তুত আল-কুরআন অবিকৃত ও অপরিবর্তিত গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত এতে কোনোরূপ সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বিয়োজন হয়নি, আর ভবিষ্যতেও হবে না।

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও মর্যাদাপূর্ণ কিতাব। এতে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য, ইতিহাস, ভবিষ্যদ্বাণী, বিজ্ঞান, সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি বিষয় খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটি যেহেতু আল্লাহ তায়ালার বাণী সুতরাং এর মর্যাদাও তাঁরই ন্যায় অতুলনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

অর্থ : "বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত ২১-২২)

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় ভাস্বর। এটি পরিবর্তন, বিকৃতি, সংযোজন-বিয়োজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

আমরা পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য অনুধাবন করব। ভক্তি ও সম্মান সহকারে আমরা কুরআন পাঠ করব এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করে তা আমাদের বাস্তব জীবনে কার্যকর করব। কুরআনই হবে আমাদের জীবন চলার পাথেয়।

কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।
খ. শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআনের ১০টি নামের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১২
নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা

পথহারা ও পথভ্রষ্ট মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাই আসমানি কিতাব। আসমানি কিতাব হলো আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ও বিধি-নিষেধের সমন্বিত গ্রন্থ। মানব জীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে আসমানি কিতাব অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আসমানি কিতাবগুলো মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। তাছাড়া মানুষ আসমানি কিতাবের বর্ণনা দ্বারা পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ও পরিচয় জানতে পারে। এসব বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে সত্য ও সুন্দর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করে।

আল্লাহ্ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে বহু নবি-রাসুলের ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তাঁদের অনুসারী পুণ্যবান ও মুমিনদের সফলতার কাহিনীও তুলে ধরেছেন। আসমানি কিতাবের মাধ্যমে মানুষ এসব কাহিনী ও ঘটনা জানতে পারে। তাঁদের সফলতা ও সম্মানের মূল চাবিকাঠি হিসেবে নৈতিকতার গুরুত্ব বুঝতে পারে। ফলে মানুষ নৈতিক জীবন গঠনে উৎসাহিত হয়। নবি-রাসুলগণের ঘটনার পাশাপাশি আসমানি কিতাবসমূহে কাফির, মুশরিক ও পাপাচারীদের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ করা হয়েছে এজন্য যে, মানুষ যেন এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করে। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআনে ফিরআউন, নমরূদ, কারুন প্রমুখ নাফরমানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আদ, ছামুদ ইত্যাদি পাপাচারী জাতিসমূহের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা, গর্ব-অহংকার, পাপাচার, মিথ্যাচার, অনৈতিক ও অশ্লীল কার্যকলাপের দরুন তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা আমরা আসমানি কিতাবের মাধ্যমেই জানতে পারি। এসব ঘটনা আমাদের অনৈতিক ও অন্যায় কার্যাবলি থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ ও মানবিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে।

জ্ঞান বা শিক্ষা হলো এক প্রকার আলো। এটি মানুষের অন্তর চক্ষুকে খুলে দেয়। শিক্ষিত মানুষ ব্যর্থতার কারণ ও সফলতার সোপান সম্পর্কে অবগত থাকে। সুশিক্ষিত মানুষ নৈতিক ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয় এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে শান্তি ও সফলতা লাভ করে থাকে। আসমানি কিতাব মূলত জ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস। আসমানি কিতাব মানুষকে সবধরনের কল্যাণের পথনির্দেশ করে। আল-কুরআন

প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

অর্থ : "এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশক।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ০২)

আল-কুরআন হলো সকল জ্ঞানের আধার। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলনীতি ও সারকথা এ গ্রন্থে নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আল-কুরআনের শিক্ষা মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলে ও নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে।

আসমানি কিতাবসমূহে মানুষকে নীতি-নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব গ্রন্থে উন্নত আদর্শ ও সৎগুণাবলির নানা বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি যেসব কাজ ও অভ্যাসের দ্বারা নৈতিক জীবনাচরণ লঙ্ঘিত হয় সে সম্পর্কে সতর্ক ও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি কিতাব পাঠ করলেও মানবিকতার বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর থেকে অন্য কিতাবগুলোর কার্যকারিতা রহিত করা হয়েছে। সর্বোপরি আল-কুরআনে নীতি-নৈতিকতার পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে। এ কিতাব অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে মানব জীবন নীতি-নৈতিকতামণ্ডিত সুন্দর ও শান্তিময় হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৩

আখিরাত

পরিচয়

আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। মানবজীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর মৃত্যুর পরে মানুষের যে নতুন জীবন শুরু হয় তার নাম পরকাল বা আখিরাত।

আখিরাত অনন্তকালের জীবন। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর ভালো কাজের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত এবং মন্দ কাজের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাত ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামি জীবনদর্শনে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। এ বিশ্বাসের গুরুত্বও অপরিসীম। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

অর্থ : "আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)

তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি আখিরাতেও বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। পরকালীন জীবনের সফলতা ও জান্নাত লাভ করার জন্যও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

অর্থ : "আর কেউ আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৩৬)

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। কেননা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, পরকালে তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ফলে বিশ্বাসী ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এভাবে মানুষ অসৎচরিত্র বর্জন করে সৎচরিত্রবান হয়ে ওঠে। অপরদিকে আখিরাতে যে অবিশ্বাস করে সে সুযোগ পেলেই পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেননা সে পরকালীন জবাবদিহিতে বিশ্বাসী নয়। এভাবে আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস মানবসমাজে অত্যাচার ও পাপাচার বৃদ্ধি করে। আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ কখনো পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

অন্যদিকে, আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানবজীবনকে কলুষমুক্ত, পবিত্র ও সুন্দর করে তোলে।

অতএব, আমরা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান আনব এবং আখিরাতে মুক্তির জন্য সৎ ও সুন্দর কাজ করব এবং ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করে জীবন-যাপন করব।

পাঠ ১৪

আখিরাতের কয়েকটি স্তর

আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে। এ জীবন চিরস্থায়ী ও অনন্ত। এ জীবনের কোনো শেষ নেই। আখিরাত বা পরকালের বেশ কয়েকটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। এ পাঠে আমরা সংক্ষেপে আখিরাতের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে জানব।

ক. মৃত্যু

আখিরাত বা পরকালীন জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে। সুতরাং মৃত্যু হলো পরকালের প্রবেশদ্বার।

আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণীর মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

অর্থ : "প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

দুনিয়ার কোনো প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সুস্থ-অসুস্থ, শাসক-শাসিত কেউই মৃত্যুকে এড়াতে পারবে না। যত বড় ক্ষমতাধারীই হোক আর যত সুরক্ষিত স্থানে বসবাস করুক সবার নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু হবেই। এছাড়াও অন্যান্য প্রাণীরও মৃত্যু অনিবার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

অর্থ : "তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭৮)

মৃত্যুর সাথে সাথে আখিরাতের জীবন শুরু হয়। পুণ্যবান মানুষের মৃত্যু হয় আল্লাহ তায়ালার রহমতের সাথে। আর পাপীদের মৃত্যু খুব কষ্টকর হয়।

খ. কবর

মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে কবরের জীবন বলা হয়। এর অপর নাম বারযাখ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

অর্থ : "আর তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১০০)

দুনিয়াতে মানুষকে মৃত্যুর পর কবরস্থ করা হয়। এসময় মুনকার-নাকির নামক দুজন ফেরেশতা কবরে আসেন। তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন। এগুলো হলো-

১। مَنْ رَّبُّكَ ؟ - তোমার রব কে?

২। وَمَا دِيْنُكَ ؟ - তোমার দীন কী?

৩। وَمَنْ نَّبِيُّكَ ؟ - তোমার নবি কে? অথবা, وَمَنْ هٰذَا الرَّجُلُ ؟ (রাসুল (স.) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়) এই ব্যক্তি কে?

যাদের কবর দেওয়া হয় না তাদেরও এ প্রশ্ন করা হবে। দুনিয়াতে যারা ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে তারা এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে। তাদের জন্য কবরের জীবন হবে শান্তিময়। আর যারা ইসলাম অনুসরণ করবে না তারা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। তারা বলবে, 'আফসোস! আমি জানি না।' কবরের জীবনে তারা কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

গ. কিয়ামত

আকাইদ শাস্ত্রে কিয়ামত বলতে দুটি অবস্থাকে বোঝানো হয়।

প্রথমত : কিয়ামত অর্থ মহাপ্রলয়। আল্লাহ তায়ালা এ গোটা বিশ্ব মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন গোটা বিশ্বে মহান আল্লাহর ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না। এমনকি আল্লাহ নাম নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যাবে না। সকল মানুষ গোমরাহি ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। সেসময় আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন। তাঁর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। ফলে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি খসে পড়বে, পাহাড় পর্বত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে, ভূগর্ভস্থ সবকিছু বের হয়ে যাবে, সকল প্রাণী মৃত্যু বরণ করবে এবং গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সময় শুধু আল্লাহ তায়ালা থাকবেন। আর কেউ বিদ্যমান থাকবে না। পৃথিবী ধ্বংসের এ মহাপ্রলয়ের নাম কিয়ামত।

দ্বিতীয়ত : কিয়ামতের অন্য অর্থ দাঁড়ানো। পৃথিবী ধ্বংসের বহুদিন পর আল্লাহ তায়ালা আবার সকল জীব ও প্রাণীকে জীবিত করবেন। আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফিল (আ.) পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। তখন মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশের জন্য সমবেত হবে। ঐ সময়ে কবর থেকে উঠে দাঁড়ানোকে বলা হয় কিয়ামত। একে 'ইয়াওমুল' বা 'আছ' বা পুনরুত্থান দিবসও বলা হয়।

কিয়ামতের এ উভয়বিধ অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۝

অর্থ : "আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" (সূরা আয্-যুমার, আয়াত ৬৮)

ঘ. হাশর

হাশর হলো মহাসমাবেশ। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সকল মানুষ ও প্রাণীকুল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে। সকলেই সেদিন একজন আহবানকারী ফেরেশতার ডাকে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এ ময়দান বিশাল ও সুবিন্যস্ত। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন এ মাঠে একত্রিত হবে। মানুষের এ মহাসমাবেশকেই হাশর বলা হয়।

হাশরের ময়দান হলো হিসাব নিকাশের দিন, জবাবদিহির দিন। এদিন আল্লাহ তায়ালা হবেন একমাত্র বিচারক। আল্লাহ তায়ালা বলেন- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

অর্থ : "তিনি (আল্লাহ) বিচার দিবসের মালিক।" (সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত ৩)

সেদিন সকল মানুষের সমস্ত কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। হাশরের ময়দানে মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে। যাঁরা পুণ্যবান তারা ডান হাতে আমলনামা লাভ করবেন। আর পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে।

হাশরের ময়দান ভীষণ কষ্টের স্থান। সেদিন সূর্য মাথার উপর একেবারে নিকটে থাকবে। মানুষ প্রচণ্ড তাপে ঘামতে থাকবে। সেদিন আল্লাহ্ তায়ালার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।

সাত শ্রেণির লোক সেদিন আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে। এদের মধ্যে একশ্রেণি হলো সেসব ব্যক্তি যে যৌবনকালে আল্লাহর ইবাদত করেছে। হাশরের ময়দানে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। একমাত্র হাউজে কাউছারের পানি থাকবে। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সেদিন তাঁর খাটি উম্মতগণকে হাউজে কাউছার থেকে পানি পান করাবেন। পাপীরা সেদিন তৃষ্ণায় নিদারুণ কষ্ট ভোগ করবে।

বস্তুত পুণ্যবানগণ হাশরের ময়দানে নানাবিধ সুবিধাজনক স্থান লাভে ধন্য হবেন। পক্ষান্তরে পাপীরা হাশরের ময়দানেই কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

ঙ. মিযান

মিযান অর্থ পরিমাপক যন্ত্র বা দাঁড়িপাল্লা। হাশরের ময়দানে মানুষের আমলসমূহ ওজন করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যে পাল্লা প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে মিযান বলা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

অর্থ: "আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৪৭)

মিযানের পাল্লায় মানুষের পাপ পুণ্য ওজন করা হবে। যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যার পাপের পাল্লা ভারী হবে সে হবে জাহান্নামি।

চ. সিরাত

সিরাত এর শাব্দিক অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, সেতু ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের ভাষায় সিরাত হলো হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান্নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু। (তিরমিযি)। এ সেতু পার হয়ে নেক আমলকারী বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ সেতুতে আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ

অর্থ: "জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

নেক আমলকারী বান্দাগণকে মহান আল্লাহ্ জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। জান্নাতিগণ সিরাতের উপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। নেককারদের জন্য তাঁদের আমল অনুসারে সিরাত প্রশস্ত হবে। ইমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ ঝড়ের গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউবা দৌড়ের গতিতে, কেউ হেঁটে হেঁটে আবার কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে সিরাত পার হবেন।

সিরাত হলো অন্ধকার পুল। সেখানে মুমিন ও নেক আমলকারী ব্যক্তির জন্য আলোর ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু যারা ইমানদার নয় এবং পাপী তাদের জন্য কোনো আলোর ব্যবস্থা থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যে দৃঢ় ইমান ও বেশি নেক আমলের অধিকারী সিরাত তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি আলোকিত হবে। ইমানের আলোতে সে সহজেই সিরাত অতিক্রম করবে।

অন্যদিকে যারা ইমানদার নয় এবং পাপী মহান আল্লাহ্ তাদের জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। জাহান্নামিদের জন্য সিরাত অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। তাদের জন্য সিরাত হবে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা ধারালো। এ অবস্থায় সিরাতে আরোহণ করে তারা কিছুতেই তা অতিক্রম করতে পারবে না। বরং তারা করুণভাবে জাহান্নামে পতিত হবে।

অতএব, আমরা সিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করব। সহজে সিরাত অতিক্রম করার জন্য প্রকৃত ইমানদার হব এবং সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ বর্জন করে অধিক পরিমাণে নেক আমল করব। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করব।

ছ. শাফাআত

শাফাআত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের সকল কাজকর্মের হিসাব নেবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন। তখন মহান আল্লাহ্ পুণ্যবানগণকে জান্নাতে ও পাপীদের জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। নবি-রাসুল ও পুণ্যবান বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন। ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে। এরপর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

আবার অনেক পুণ্যবানের জন্যও এদিন শাফাআত করা হবে। ফলে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে। সেদিন সূর্য খুব নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত থাকবে। এ সময় তারা হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআত করতে অনুরোধ করবে। তাঁরা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করবেন। এ অবস্থায় সকল মানুষ মহানবি (স.)-এর নিকট উপস্থিত হবে। তখন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবেন।

অন্যদিকে কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ, আলেম, হাফিয এ শাফাআতের সুযোগ পাবেন। আল-কুরআন ও সিয়াম (রোযা) কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা এসব শাফাআত কবুল করবেন এবং বহু মানুষকে জান্নাত দান করবেন। তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অধিকারে। তিনি নিজেই বলেছেন- أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

অর্থ : "আমাকে শাফাআত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।" (বুখারি মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন, "পৃথিবীতে যত ইট ও পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত করব।" (মুসনাদে আহমাদ)

শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত। মহানবি (স.)-এর শাফাআত ব্যতীত কিয়ামতের দিন সফলতা, কল্যাণ ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে না।

অতএব, আমরা শাফাআতে বিশ্বাস স্থাপন করব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-কে ভালোবাসব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করব। তাহলে পরকালে আমরা প্রিয়নবি (স.)-এর শাফাআত লাভে ধন্য হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

জ. জান্নাত

জান্নাত অর্থ উদ্যান, বাগান, সুশোভিত কানন। ইসলামি পরিভাষায় পরকালীন জীবনে পুণ্যবানগণের জন্য পুরস্কার স্বরূপ যে আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে বলা হয় জান্নাত।

জান্নাতে সবধরনের নিয়ামত বিদ্যমান। মুমিনগণ সেখানে চিরকাল অবস্থান করবেন। তাঁরা সেখানে তাঁদের পুণ্যবান মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হবেন। তাঁরা যা চাইবেন তাই সাথে সাথে লাভ করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।" (সূরা হা-মিম আস-সাজদা, আয়াত ৩১-৩২)

বস্তুত জান্নাতের সুখ-শান্তি ও নিয়ামত অফুরন্ত। এর বর্ণনা শেষ করা যায় না। একটি হাদিসে কুদসিতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান কোনোদিন তা শুনেনি এবং কোনো মানব হৃদয় কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।" (বুখারি)

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য আটটি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো হলো- (১) জান্নাতুল ফিরদাউস, (২) দারুল মাকাম, (৩) দারুল কারার, (৪) দারুস্সালাম, (৫) জান্নাতুল মাওয়া, (৬) জান্নাতুল আদন, (৭) দারুন নাইম ও (৮) দারুল খুলদ।

জান্নাত চরম সুখের আবাস। দুনিয়াতে যারা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে চলবে তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে। সকল কাজকর্মে আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করলে জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰی ۝

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাস।" (সূরা আন-নাযিআত, আয়াত ৪০-৪১)

সুতরাং আমরাও জান্নাত লাভের জন্য সদা সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করব, তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলব, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে উত্তম চরিত্র গঠন করব। তাহলে মহান আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন, আমরা পরকালে জান্নাত লাভ করব।

ঝ. জাহান্নাম

জাহান্নাম হলো শাস্তির স্থান। পরকালে মুমিনগণের জন্য যেমন জান্নাতের ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি পাপীদের জন্য রয়েছে শাস্তির স্থান। আর জাহান্নামই হলো সে শাস্তির জায়গা। জাহান্নামকে نَارٌ (নার) বা আগুনও বলা হয়।

জাহান্নাম চির শাস্তির স্থান। এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষের পাপের পরিমাণ অনুসারে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত উত্তপ্ত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ

অর্থ : "তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।" (বুখারি)

এ আগুনে মানুষের হাড়, চামড়া, গোশত সবকিছুই পুড়ে যাবে। কিন্তু তাতে তার মৃত্যু হবে না। বরং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে পুনরায় তার দেহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পুনরায় তা পুড়ে দগ্ধ হবে। এভাবে পুনঃপুনঃ চলতে থাকবে।

জাহান্নাম বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছুর আবাসস্থল। সেখানকার খাদ্য হলো বড় বড় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। উত্তপ্ত রক্ত ও পুঁজ হবে জাহান্নামিদের পানীয়। মোটকথা জাহান্নাম অতি যন্ত্রণাদায়ক স্থান। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "যারা কুফরি করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, ফলে তাতে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত হয়ে যাবে, আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ী। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে, আস্বাদন কর দহন-যন্ত্রণা।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ১৯-২২)

পাপীদের শাস্তিদানের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা ৭টি দোযখ তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো হলো- (১) জাহান্নাম, (২) হাবিয়া, (৩) জাহিম, (৪) সাকার, (৫) সাইর, (৬) হুতামাহ এবং (৭) লাযা।

জাহান্নাম হলো ভীষণ শাস্তির স্থান। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা তথায় চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۝ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝

অর্থ : "অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস।" (সূরা আন- নাযিআত, আয়াত ৩৭-৩৯)

যাদের ইমান রয়েছে কিন্তু পাপের পরিমাণ বেশি এমন মুমিনরাও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তবে তাদের পাপের শাস্তি শেষ হওয়ার পর তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

আমরা সব রকম পাপ থেকে মুক্ত থাকব। খাঁটি ইমানদার হব। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্য করব। তাহলেই জাহান্নামের আগুন ও শাস্তি থেকে আমরা রেহাই পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আখিরাতের জীবনের স্তরগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৫

সৎকর্মশীল ও নৈতিকজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। আখিরাত হলো মানুষের অনন্ত জীবন। এটি চিরস্থায়ী। পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। বস্তুত দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র। বলা হয়েছে- اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

অর্থ : "দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।" (প্রবাদ)

মানুষ শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ করে, বীজ বপন করে, যেভাবে পরিচর্যা করে; ঠিক সেরূপই ফল লাভ করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার শস্যক্ষেত্রের পরিচর্যা না করে তবে সে ভালো ফসল লাভ করে না। তদ্রূপ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান আখিরাতে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে মানুষ পুরস্কৃত হবে। আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে।

কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাত জীবনের এক একটি পর্যায়। ইসলামি বিশ্বাস মোতাবেক, যে ব্যক্তি ইমান আনে, সৎকর্ম করে সে আখিরাতে শান্তিময় জীবন লাভ করবে। কবর থেকে শুরু করে আখিরাতের প্রতিটি পর্যায়ে সে সুখ, শান্তি ও সফলতা লাভ করবে। অন্যদিকে দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অবাধ্য হবে, পাপাচার করবে সে আখিরাতের সকল পর্যায়ে কষ্ট ভোগ করবে। তার স্থান হবে জাহান্নাম।

মানবজীবন গঠনের জন্য আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ তার ভুল-ত্রুটি শুধরে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে।

২০২৫

আখিরাতে পুণ্যবানকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হবে। জান্নাত হলো চিরশান্তির স্থান। জান্নাত লাভের আশা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সৎকর্মশীল করে তোলে। মানুষ জান্নাত ও তার নিয়ামত প্রাপ্তির আশায় নেক আমল করে, ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সৎকর্ম ব্যতীত জান্নাত লাভ করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আল-বুরূজ, আয়াত ১১)

এভাবে পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভের আশা মানুষকে সৎকর্মশীল হতে সাহায্য করে।

জাহান্নাম অতি কষ্টের স্থান। এতে রয়েছে সাপ, বিচ্ছু ও আগুনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। দুনিয়ার জীবনের পাপী, অবাধ্য ও মন্দ আচরণের লোকদের পরকালে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ○ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ○

অর্থ : "অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস।" (সূরা আন- নাযিআত, আয়াত ৩৭-৩৯)

জাহান্নামের শাস্তির ভয়ও মানুষকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ না মানা, পার্থিব লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে অন্যায় অনৈতিক কাজ করা ইত্যাদি জাহান্নামিদের কাজ। সুতরাং জাহান্নামের ভয়ে মানুষ এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে।

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে বড় বড় অন্যায় এবং অনৈতিক কাজের পাশাপাশি ছোট ছোট পাপ ও অসৎ কাজ থেকেও বিরত রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ○

অর্থ : "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখবে।" (সূরা আল-যিলযাল, আয়াত ৭-৮)

আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সামান্যতম ভালো বা মন্দ কাজ সবই প্রদর্শন করবেন। অতঃপর এগুলোর পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

আমরা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করব এবং এ বিশ্বাসের আলোকে ইহকালে আমাদের জীবনকে পাপমুক্ত রাখব, সৎকর্মশীল হব এবং নৈতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হব।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা 'সৎকর্মশীল হতে ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা' সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসকে কী বলা হয়?

ক. ইমান　　খ. ইসলাম

গ. ইহসান　　ঘ. ইনসাফ

২. 'আলহিকমাতু' শব্দের অর্থ কী?

ক. উপদেশ　　খ. প্রজ্ঞা

গ. জ্যোতি　　ঘ. অনুগ্রহ

৩. মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করবে, কারণ তারা-

i. সমাজে চিহ্নিত মানুষ

ii. অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে

iii. কাফিরদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার পদ্ধতি একই নিয়মে চলে আসছে। এ অবস্থা দেখে সুলতান সাহেব বিশ্বাস করেন, পৃথিবী কখনোই ধ্বংস হবে না।

৪. সুলতান সাহেব আখিরাতের কোন বিষয়টিকে অস্বীকার করেন?

ক. কবর	খ. হাশর
গ. কিয়ামত	ঘ. মিযান

৫. সুলতান সাহেবের ধারণার ফলে, তাকে বলা যায়–

ক. কাফির	খ. মুশরিক
গ. ফাসিক	ঘ. মুনাফিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফরিদ ও সেলিম দুই বন্ধু। তারা উভয়ে একটি দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে গেল। ফরিদ সেখানে মাটির তৈরি মূর্তি ও পাথরের কারুকার্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সিজদাহ করার মত মাথানত করে সম্মান প্রদর্শন করে। এরপর উভয়ে কেন্টিনে নাস্তা করার এক পর্যায়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সেলিম মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন নবী রাসূলগণের আগমনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকাই যুক্তিযুক্ত।

ক. ইসলাম এর ব্যবহারিক অর্থ কী ?
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য কেন ? ব্যাখ্যা কর।
গ. ফরিদের আচরণে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. নবী রাসূলগণের আগমন বিষয়ে সেলিমের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর।

২. প্রেক্ষাপট-১
আদাক্ষর সু নামক প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তার পেশাগত প্রশিক্ষণ, এমনকি ডিপ্লোমা সনদ নেই। তারপরও তারা চিকিৎসক ও সেবিকা সেজে স্পর্শকাতর পরীক্ষা চালাচ্ছেন ও লোকজনকে টিকা দিচ্ছেন। এই সুযোগে তারা হাজার হাজার টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন। (সংক্ষেপিত : প্রথম আলো, ০৫ জুলাই ২০১২)

প্রেক্ষাপট-২

অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার এভাবে বাড়তে থাকলে খুব শীঘ্রই মানবজাতি জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রাণরক্ষার যুদ্ধে পরাস্ত হবে। গৃহপালিত পশুপাখিকে রোগমুক্ত রেখে কম সময়ে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের অবাধ ব্যবহার হয়ে আসছে। পোলট্রিতে উৎপাদন বাড়াতে অর্থাৎ পোলট্রির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অনেক খামারি গ্রোথ প্রোমোটার হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে। যা হৃদরোগীর জন্য খুবই ক্ষতিকর। (সংক্ষেপিত: যুগান্তর ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১২)

ক. আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা কী?

খ. 'তাওহিদের স্বরূপ' ব্যাখ্যা কর।

গ. ১ নম্বর প্রেক্ষাপটে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ২ নম্বর প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টি ফুটে ওঠে, তা 'সৎকর্মশীল হতে ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা'র আলোকে বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরিয়তের উৎস

ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন বিধি-বিধানের সমষ্টি। বিশ্বাসগত বিষয়গুলোর পাশাপাশি মানবজীবনের আচরণগত সমস্ত দিকও ইসলামে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য নানা বিধি-বিধান ও আচার-আচরণগত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ প্রদত্ত এসব বিধি-বিধানকেই শরিয়ত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা ও মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) -এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, সকল কাজে তাঁদের আনুগত্য করা, শরিয়তের অন্যতম দাবি। এগুলোর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সফলতা লাভ করা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামি শরিয়তের পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানব। পাশাপাশি শরিয়তের উৎসগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- শরিয়ত ও শরিয়তের উৎসের ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- কুরআন ও হাদিসের সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব;
- মক্কি ও মাদানি সূরার সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারব;
- নির্বাচিত সূরাগুলো শুদ্ধভাবে মুখস্থ বলতে পারব;
- নির্বাচিত সূরাগুলোর অর্থ ও পটভূমিসহ (শানে নুযুল) শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- কুরআনের নির্বাচিত সূরাগুলোর শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হব;
- নির্বাচিত দশটি হাদিসের অর্থ ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অর্জনের ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নির্বাচিত হাদিসসমূহের শিক্ষার আলোকে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত হব;
- ইজমা এর পরিচয় ও উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- কিয়াস এর ধরন বর্ণনা করতে পারব;
- শরিয়তের বিভিন্ন পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব।

পাঠ ১

শরিয়ত (شَرِيْعَةٌ)

পরিচয়

শরিয়ত আরবি শব্দ। এর অর্থ পথ, রাস্তা। এটি জীবনপদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শরিয়ত হলো এমন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট পথ, যা অনুসরণ করলে মানুষ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিজ

গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। ইসলামি পরিভাষায়, ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়। অন্যকথায়, ইসলামি আইন-কানুন বা বিধি-বিধানকে একত্রে শরিয়ত বলা হয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) যেসব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশনা মানুষকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রদান করেছেন তাকে শরিয়ত বলে।

শরিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ : "অতঃপর আমি আপনাকে শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি তার অনুসরণ করুন। আর আপনি অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।" (সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত ১৮)

শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি

শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি হলো মানবজাতির জন্য সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল বিষয়ের বিধি-বিধান ও নির্দেশনা এতে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

সুতরাং বোঝা গেল যে, ইসলামি শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মুসলিম মনীষীগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

ক. আকিদা বা বিশ্বাসগত বিধি-বিধান।

খ. নৈতিকতা ও চরিত্র সংক্রান্ত রীতি-নীতি।

গ. বাস্তব কাজকর্ম সংক্রান্ত নিয়মকানুন।

বস্তুত মানুষের সবধরনের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের আওতাভুক্ত। ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সকল কাজই শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়তের নির্দেশনার বাইরে কোনো কাজই নেই।

শরিয়তের গুরুত্ব

মানবজীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। শরিয়ত হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ ও বিধি- বিধান। সুতরাং শরিয়ত মেনে চললে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল খুশি হন। অন্যদিকে, শরিয়ত অস্বীকার করা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করার নামান্তর। কোনো মুসলমান এরূপ কাজ করতে পারে না। এমনকি শরিয়তের এক অংশ পালন করা আর অন্য অংশ অস্বীকার করাও মারাত্মক

পাপ (কুফর)। যে ব্যক্তি এরূপ করে তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। আর কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৮৫)

শরিয়ত হলো জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা। এর দ্বারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি-নিষেধ জানা যায়।

কোনটি হালাল, কোনটি হারাম ইত্যাদি জানা যায়। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানও শরিয়তের শিক্ষার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার নানা শিক্ষাও শরিয়তে বিবৃত রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য শরিয়ত অপরিহার্য।

তাছাড়া শরিয়ত আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি কীভাবে, কোথায়, কোন সময়ে আদায় করতে হয় তাও শরিয়তের বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায়, পারিবারিক ও সামাজিক সম্প্রীতি ইত্যাদিও শরিয়তের আওতাভুক্ত। অতএব, মানুষের সার্বিক জীবনাচরণে শরিয়তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শরিয়তের উৎসসমূহ

শরিয়ত হলো ইসলামি জীবনপদ্ধতি। এটি আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধ ও দিকনির্দেশনার সমষ্টি। অতএব, শরিয়ত এর প্রধান উৎস দুটি। যথা- আল-কুরআন ও আল-হাদিস বা সুন্নাহ্।

পরবর্তীতে কুরআন ও সুন্নাহ্ এর স্বীকৃতি ও নির্দেশনার ভিত্তিতে শরিয়তের আরও দুটি উৎস নির্ধারণ করা হয়। এগুলো হলো ইজমা ও কিয়াস। সুতরাং আমরা বলতে পারি- শরিয়ত এর উৎস চারটি। যথা-

১. আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ)

২. সুন্নাহ (اَلسُّنَّةُ)

৩. ইজমা (اَلْاِجْمَاعُ)

৪. কিয়াস (اَلْقِيَاسُ)

আমরা পর্যায়ক্রমে শরিয়তের এ চারটি উৎস সম্পর্কে জানব।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা ইসলামি শরিয়তের পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২

শরিয়তের প্রথম উৎস : আল-কুরআন

শরিয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস হলো আল-কুরআন। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎসই আল- কুরআন। এর উপরই ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। আল-কুরআন শরিয়তের অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধানসূচক মূলনীতি ও ইঙ্গিত আল-কুরআনে বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : "আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৮৯)

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এ কিতাব নাজিল করেন। এ কিতাব আরবি ভাষায় নাজিলকৃত। ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস হিসেবে আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি ও নির্দেশনা বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

অর্থ : "আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮৯)

কুরআন মজিদ সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাজিলকৃত। এতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা, বক্রতা, কিংবা জটিলতা নেই। বরং এতে খুবই সুন্দর ও সরল ভাষায় নানা বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। অতি সাধারণ মানুষও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

অর্থ : "আর আমি তো কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আদ-দুখান, আয়াত ৫৮)

অবতরণ

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম। এটি 'লাওহে মাহফুজ' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

অর্থ : "বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (সূরা আল-বুরূজ, আয়াত ২১-২২) ২০২৫

আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম কদরের রাতে পোটা কুরআন মজিদ লাওহে মাহফুজ থেকে 'বায়তুল ইযযাহ' নামক স্থানে নাজিল করেন। বায়তুল ইযযাহ্ হলো প্রথম আসমানের একটি বিশেষ স্থান।

মহানবি (স.) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ.) আল-কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে তথায় মহানবি (স.)-এর নিকট অবতরণ করেন। এটাই ছিল দুনিয়াতে আল-কুরআনের প্রথম নাজিলের ঘটনা। এরপর বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (স.)-এর প্রতি কুরআন নাজিল হয়।

এভাবে মহানবি (স.)-এর জীবদ্দশায় মোট ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়। এটি একসাথে নাজিল হয়নি। বরং অল্প অল্প করে প্রয়োজনানুসারে নাজিল হতো। কখনো ৫ আয়াত, কখনো ১০ আয়াত, কখনো আয়াতের অংশবিশেষ, আবার কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা একসাথে নাজিল হতো। আল্লাহ্ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ○

অর্থ : "আর আমি খণ্ড-খণ্ডভাবে কুরআন নাজিল করেছি যাতে আপনি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন আর আমি তা ক্রমশ নাজিল করেছি।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১০৬)

অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় আল-কুরআন একসাথে নাজিল করা হয়নি। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি একসাথে পূর্ণাঙ্গ আকারে নাজিল করা হয়েছিল। কিন্তু আল-কুরআন এর ব্যতিক্রম। এটি আল-কুরআনের বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক। মক্কার কাফিররা এ সম্পর্কে রাসুল (স.)-কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "কাফিররা বলে, তাঁর উপর সমগ্র কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি আপনার হৃদয়কে তার দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং আমি তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৩২)

আল-কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী। জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা অল্প অল্প করে মহানবি (স.)-এর ২৩ বছরের নবুওয়াতি জীবনে পূর্ণরূপে নাজিল করেন।

পাঠ ৩

আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের সার্বিক জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা এতে বিদ্যমান। সুতরাং এর সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ্ স্বয়ং এর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

অর্থ : "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

আল-কুরআন আরব দেশে মহানবি (স.)-এর উপর নাজিল হয়। এ সময় মহানবি (স.) সাথে সাথে নাজিলকৃত আয়াত মুখস্থ করে নিতেন। এরপর বারবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন। আল-কুরআন মুখস্থকরণে রাসুল (স.)-এর দ্রুতপাঠ ও ব্যাকুলতা দেখে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

অর্থ: "তাড়াতাড়ি ওহি আয়ত্ত করার জন্য আপনি দ্রুত আপনার জিহ্বা তাঁর সাথে সঞ্চালন করবেন না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।" (সুরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ১৬-১৭)

এরপর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ব্যাকুলতা দূরীভূত হয় এবং তিনি সহজেই কুরআনের আয়াতগুলো মুখস্থ করে সংরক্ষণ করতে লাগলেন।

আল-কুরআন নাজিল হলে রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণকেও তা মুখস্থ করতে বলতেন। সাহাবিগণ তা মুখস্থ করতেন, দিনরাত তিলাওয়াত করতেন, নামাযে পাঠ করতেন এবং পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদেরও মুখস্থ করাতেন। গভীর রাতে তাঁদের ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের গুনগুন আওয়াজ শোনা যেত। অনেক সময় রাসুলুল্লাহ (স.) স্বয়ং তাঁদের গৃহপার্শ্বে গিয়ে তিলাওয়াত শুনতেন।

কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবি করিম (স.) সাহাবিগণকে নানা স্থানে প্রেরণ করতেন। যেমন হিজরতের পূর্বে তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য মদিনায় প্রেরণ করেন।

এভাবে মুখস্থ করার মাধ্যমে আল-কুরআন সর্বপ্রথম সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, তৎকালীন আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। তারা কোনো জিনিস শিখলে তা আর কখনো ভুলত না। ফলে এ অসাধারণ স্মরণশক্তির কারণে পবিত্র কুরআন সহজেই তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়।

এছাড়া সেসময় লিখিতভাবেও আল-কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আরবদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই ছিল শিক্ষিত। তা ছাড়া সেসময় লেখার উপকরণও ছিল দুষ্প্রাপ্য। এজন্য সেসময় আল-কুরআন একত্রে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। তবে আল-কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নাজিল হলে সাথে সাথেই লিখে রাখা হতো। খেজুর গাছের ডাল, পশুর চামড়া ও হাড়, পাথর, গাছের পাতা ইত্যাদি ছিল তখনকার লেখনীর উপকরণ। সাহাবিগণ এগুলোতেই আল-কুরআনের আয়াত লিখে তা সংরক্ষণ করতেন।

যেসব সাহাবি লেখাপড়া জানতেন তাঁরা প্রায় সকলেই কুরআন লিখার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আল-কুরআন লিপিবদ্ধকারী সাহাবিগণকে বলা হয় কাতিবে ওহি বা ওহি লেখক। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় মোট

২০২৫

৪২ জন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)। এছাড়াও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলি (রা.), হযরত মুআবিয়া (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.), হযরত আমর ইবনে আস (রা.), হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এঁদের কেউ না কেউ সদা সর্বদা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে থাকতেন এবং কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নাজিল হলে সাথে সাথে তা লিখে নিতেন। এভাবে লেখনীর মাধ্যমেও আল-কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন সংকলন

মহানবি (স.)-এর সময়ে আল-কুরআন মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সে সময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়নি। বরং তাঁর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ টুকরোগুলো নানাজনের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তাঁর সময়ে নবুয়তের কতিপয় মিথ্যা দাবিদার বা ভণ্ড নবি ও যাকাত অস্বীকারকারীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এরূপই একটি যুদ্ধ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। এটি মুসায়লিমা কাযযাব নামক ভণ্ড নবির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এ যুদ্ধে বহুসংখ্যক কুরআনের হাফিয সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন। এতে হযরত উমর (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন যে, এভাবে হাফিয সাহাবিগণ শাহাদাত বরণ করতে থাকলে একসময় কুরআন মুখস্থকারী লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেবে। সুতরাং তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরআন সংকলন করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দান করেন। পরামর্শ শ্রবণে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে উমর! রাসুলুল্লাহ (স.) যে কাজ করে যাননি তা আপনি কীভাবে করতে চাচ্ছেন? হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! এতে কল্যাণ রয়েছে। এভাবে হযরত উমর (রা.) বারবার অনুরোধ করায় হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-কে এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত যায়দ (রা.) কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত চারটি পন্থা অবলম্বন করেন :

ক. হাফিয সাহাবিদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিটি আয়াতের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা যাচাইকরণ।

খ. হযরত উমর (রা.)-এর হিফযের সাথে মিলিয়ে আয়াতের বিশুদ্ধতা যাচাইকরণ।

গ. রাসুলুল্লাহ (স.)-এর উপস্থিতিতে লিখিত হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ।

গ. চূড়ান্তভাবে লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবির সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা ও যাচাইকরণ।

এভাবে চরম সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আল-কুরআন। কুরআনের এ কপিটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এটি হযরত উমর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর পবিত্র কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কন্যা, উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নানা মতানৈক্য দেখা দেয়। এর মূল কারণ ছিল বিভিন্ন গোত্রীয় রীতিতে কুরআন পাঠ। মহানবি (স.) সহজ করণার্থে আরবদের ৭টি রীতিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আরবগণ এ ৭টি রীতিতে পাঠের বিষয়টি জানতেন বলে প্রথমদিকে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ইসলামি খেলাফতের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে অনারবগণ মুসলমান হতে লাগল। তারা আরবি ভাষার এসব আঞ্চলিক রীতিসমূহ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ফলে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এমনই এক ঘটনা ঘটে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান অঞ্চলে জিহাদের সময়। এ সময় ভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটে। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) ঘটনাটি খলিফা হযরত উসমান (রা.)-কে অবহিত করেন।

এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) প্রধান সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে কুরআন সংকলনের জন্য চারজন সাহাবির একটি বোর্ড গঠন করেন। এঁরা ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), সাঈদ ইবনে আস (রা.) এবং আব্দুর রহমান ইবনে হারিস (রা.)। এ বোর্ডের নেতৃত্ব হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) এর উপর ন্যস্ত করা হয়।

হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) সর্বপ্রথম হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট থেকে কুরআনের প্রথম পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আসেন এবং এ থেকে আরও সাতটি কপি তৈরি করেন। অনুলিপি তৈরিতে সাহাবিগণ হাফিযগণের কেরাতের সাথে মিলিয়ে পুনরায় এর নির্ভুলতা যাচাই করতেন। অতঃপর মূল কপিটি হযরত হাফসার (রা.) নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তৈরি অনুলিপিগুলোর একটি খলিফার নিকট কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হয় আর বাকিগুলো বিভিন্ন শাসনকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আল-কুরআন বিকৃতি ও গরমিলের হাত থেকে রক্ষা পায়। এরপর বিক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত কপিগুলো একত্র করে তা পুড়িয়ে বিনষ্ট করে ফেলা হয়। এভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আল-কুরআন সংকলিত হয়। এ মহান কাজের জন্য তাঁকে 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন একত্রকারী (সংকলক) বলা হয়।

কুরআনের এ সংকলনসমূহে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নির্দেশনার কোনোরূপ পরিবর্তন করা হয়নি। বরং রাসুলুল্লাহ (স.) যেভাবে কোন আয়াতের পর কোন আয়াত হবে বলে গেছেন সেভাবেই সংকলন করা হয়। এভাবে সূরাসমূহেও রাসুলুল্লাহ (স.) বর্ণিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাজানো হয়। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই রাসুলুল্লাহ (স.)-কে এরূপ ধারাবাহিকতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। জিবরাইল (আ.) যখনই কোনো আয়াত নিয়ে আসতেন তখনই ঐ আয়াত কোন সূরার কোথায় স্থাপন করতে হবে তা বলে দিতেন। সে অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (স.) ও সাহাবিগণের দ্বারা লিখিয়ে নিতেন। পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। ফলে লাওহে মাহফুজে যেভাবে কুরআন বিন্যস্ত রয়েছে বর্তমান কুরআন মজিদও ঠিক সে বিন্যাসেই বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ে তৈরিকৃত কুরআনের পাণ্ডুলিপিতে হরকত বা স্বরচিহ্ন ছিল না। ফলে অনারব মুসলমানগণ কুরআন তিলাওয়াতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হন। ইরাকের উমাইয়া বংশীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পবিত্র কুরআনে হরকত সংযোজন করে এ অসুবিধা দূর করেন। বস্তুত এটা কুরআনে কোনো নতুন সংযোজন নয়। বরং আগে হরকতসহ পড়া হলেও তা লিখা হতো না। কেননা আরবগণ এমনিই তা বুঝতে পারতেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উচ্চারিত এসব হরকতসমূহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে দেখিয়ে দেন মাত্র। ফলে অনারবগণের জন্যও কুরআন তিলাওয়াতের বাধা অপসারিত হয়।

উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে পবিত্র কুরআন আরও নবতর ও সহজ উপায়ে সংকলন করা হয়। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত হাতের লিখার মাধ্যমেই আল-কুরআন সংকলন করা হতো। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পরবর্তীতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আল-কুরআনের লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রণ করা হতে থাকে। এমনকি বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ভাষায় এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসবে।

পাঠ ৪

মাক্কি ও মাদানি সূরা

আল-কুরআন সর্বমোট ৩০টি অংশে বিভক্ত। এ অংশগুলোকে পারা বলা হয়। কুরআন মজিদে রয়েছে ১১৪টি সূরা এবং ৬২৩৬টি মতান্তরে ৬৬৬৬টি আয়াত। অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআন মজিদের সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা-মাক্কি ও মাদানি। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

মাক্কি সূরা

সাধারণভাবে বলা যায়, পবিত্র মাক্কি নগরীতে আল-কুরআনের যেসব সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলো মাক্কি সূরা। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহানবি (স.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাসমূহকে মাক্কি সূরা বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, "মহানবি (স.)-এর হিজরত কালে মদিনায় গমনের পথে মদিনায় পৌঁছার পূর্বপর্যন্ত যা নাজিল হয় তাও মাক্কি সূরা।"

আল-কুরআনে মাক্কি সূরার সংখ্যা মোট ৮৬টি।

মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মাক্কি সূরাসমূহে তাওহিদ ও রিসালাতের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

২. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম তথা আখিরাতের বর্ণনা এসব সূরায় প্রাধান্য লাভ করেছে।

৩. শিরক-কুফরের পরিচয় বর্ণনা করে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

৪. মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৫. এতে পূর্ববর্তী মুশরিক ও কাফিরদের হত্যাযজ্ঞের কাহিনী, ইয়াতীমদের সম্পদ হরণ করা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া ইত্যাদি কুপ্রথা ও কু-আচরণের বিবরণ রয়েছে।

৬. পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণের সফলতা ও তাঁদের অবাধ্যদের শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

৭. এ সূরাগুলোতে শরিয়তের সাধারণ নীতিমালার উল্লেখ রয়েছে।

৮. এতে উত্তম চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. এ সূরাসমূহ সাধারণত আকারে ছোট এবং আয়াতগুলোও তুলনামূলকভাবে ছোট।

১০. এর শব্দমালা শক্তিশালী, ভাবগম্ভীর ও অন্তরে প্রকম্পন সৃষ্টিকারী।

১১. এতে প্রসিদ্ধ বিষয়সমূহ শপথের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২. মাক্কি সূরা সমূহে يَآيُّهَا النَّاسُ (অর্থ-'হে মানবজাতি') কথাটি উল্লেখ আছে।

মাদানি সূরা

সাধারণ ভাষায় বলা যায়, মদিনাতে নাজিল হওয়া সূরাগুলো মাদানি সূরা। তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাজিল হওয়া সকল সূরাকে মাদানি সূরা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, "মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর মদিনার বাইরে সফরে থাকাবস্থায় নাজিল হওয়া সূরাসমূহও মাদানি সূরা।" অর্থাৎ হিজরতের পর নাজিল হওয়া সকল সূরাই মাদানি সূরা। মাদানি সূরা মোট ২৮টি।

মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মাদানি সূরাসমূহে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানানো হয়েছে।

২. এতে আহলে কিতাবের পথভ্রষ্টতা ও তাদের কিতাব বিকৃতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. এ সূরাসমূহে নিফাকের পরিচয় ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।

৫. পারস্পরিক লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়সহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

৬. বিচার ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৭. ইবাদতের রীতিনীতি, সালাত, যাকাত, হজ, সাওম ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হয়েছে।

৮. শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

৯. এ সূরাগুলো ও এর আয়াতসমূহ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ।

১০. মাদানি সুরা সমূহে يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (অর্থ -'হে ইমানদারগণ') কথাটি উল্লেখ আছে।

> কাজ: শিক্ষার্থীরা মাক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে একটি বড় পোস্টার বাড়িতে তৈরি করে এনে শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ৫

তিলাওয়াত : গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া, অনুসরণ করা ইত্যাদি। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামি পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়।

কুরআন মজিদ মুখস্থ পড়া যায়, আবার দেখেও তিলাওয়াত করা যায়। আল-কুরআন দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়।

কুরআন মজিদ শিখতে হলে প্রথমে দেখে দেখে তা পাঠ করতে হয়। অতঃপর হরকত, হরফ ইত্যাদি চিনে তাজবিদ সহকারে পাঠ করতে হয়। আমরা অনেকেই পুরো কুরআন মজিদ মুখস্থ করতে পারিনি। সুতরাং আমরা নিয়মিত দেখে দেখে তাজবিদসহ আল-কুরআন তিলাওয়াত করব। এভাবে দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করাও উত্তম কাজ। এতে অনেক নেকি বা সাওয়াব পাওয়া যায়।

আল-কুরআন মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। এটি হলো পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-ভাণ্ডার। এতে যেমন তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, ইবাদত ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, তেমনি পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও নির্দেশনা রয়েছে। এজন্য একজন ফরাসি পণ্ডিত যথার্থই বলেছেন, "কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য শব্দকোষ, বৈয়াকরণের জন্য ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।"

সুতরাং হালকাভাবে আল-কুরআন পাঠ করলেই চলবে না। বরং একে খুবই গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে। এর মর্মার্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। এতে বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাহলে আমরা আল-কুরআনের জ্ঞান ও শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারব। আল্লাহ্ তায়ালাও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ২৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "এটি কল্যাণময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা সা'দ, আয়াত ২৯)

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?" (সূরা আল-কামার, আয়াত ২২)

অতএব বুঝেশুনে ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন পড়া উচিত। এভাবে তিলাওয়াত করলে আল-কুরআনের শিক্ষা ও উপদেশ অনুধাবন করা যায়।

চিন্তা-গবেষণার পাশাপাশি আল-কুরআন সহিহ-শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে পাঠ করাও অত্যাবশ্যক। কুরআন মজিদ ভুল ও অসুন্দর সুরে তিলাওয়াত করলে গুনাহ হয়। অশুদ্ধ ও অসুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করলে নামায শুদ্ধ হয় না। শুদ্ধ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়মকে তাজবিদ বলা হয়। পূর্ববর্তী শ্রেণিসমূহে আমরা তাজবিদের নানা নিয়মকানুন জেনে এসেছি। তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন-

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ○

অর্থ : "আর আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত ৪)

সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ -

অর্থ : "যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।" (বুখারি)

বস্তুত রাসুলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত সুন্দর সুমধুর স্বরে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমরাও শুদ্ধ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অত্যন্ত বেশি। এর প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতেই নেকি পাওয়া যায়। নবি করিম (স.) বলেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَّالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا -

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশ গুণ।" (তিরমিযি)

বস্তুত, কুরআন তিলাওয়াত উত্তম ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

اَفْضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِىْ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ -

অর্থ : "আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত।" (বায়হাকি)

কুরআন হলো নূর বা জ্যোতি। এটি তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা সমুন্নত করে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। মানুষ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "এই অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় পানি লাগলে মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহর রাসুল (স.), এর পরিশোধক কী? তিনি বললেন, মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।" (বায়হাকি)

প্রকৃতপক্ষে, যথাযথভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। শুদ্ধ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করলে এবং এর মর্মার্থ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করলে মানুষ প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে।" (আহমাদ ও আবু দাউদ)। অতএব, আমরা কুরআন তিলাওয়াতে যত্নবান হব।

শানে নুযুল

'শান' শব্দের অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, কারণ, ঘটনা, পটভূমি। আর নুযুল অর্থ অবতরণ। অতএব, শানে নুযুল অর্থ অবতরণের কারণ বা পটভূমি। ইসলামি পরিভাষায়, আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে 'শানে নুযুল' বলা হয়। একে 'সববে নুযুল'ও বলা হয়।

আল-কুরআন মহানবি (স.)-এর প্রতি একসাথে নাজিল হয়নি। বরং নানা প্রয়োজন উপলক্ষে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। কোনো ঘটনার বিধান বর্ণনায় কিংবা কোনো সমস্যার সমাধানে কুরআনের অংশবিশেষ নাজিল হতো। যে ঘটনা বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে আল-কুরআনের আয়াত বা সূরা নাজিল হতো সে ঘটনা বা অবস্থাকে ঐ সূরা বা আয়াতের শানে নুযুল বলা হয়। যেমন : রাসুলুল্লাহ (স.)-এর শিশুপুত্র ইন্তেকাল করলে কাফিররা তাঁকে আবতার বা নির্বংশ বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা মহানবি (স.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে সূরা আল-কাওসার নাজিল করেন। অতএব, মহানবি (স.)-এর প্রতি কাফিরদের উপহাস করার ঘটনাটি সূরা আল-কাওসারের শানে নুযুল হিসেবে পরিচিত।

শানে নুযুল জানার উপকারিতা অনেক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক. এর দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়।

খ. আয়াতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্মার্থ অবগত হওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআনের কতিপয় সূরা

পাঠ ৬

সূরা আশ-শাম্‌স (سُوْرَةُ الشَّمْسِ)

পরিচয়

সূরা আশ-শামস মাক্কি সূরার অন্তর্গত। এর আয়াত সংখ্যা ১৫টি। এ সূরার প্রথম শব্দ শামস থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে আশ-শামস। এটি আল-কুরআনের ৯১তম সূরা।

শব্দার্থ

وَ	- শপথ, কসম
اَلشَّمْسِ	- সূর্য
ضُحٰهَا	- তার কিরণ
اَلْقَمَرِ	- চন্দ্র
تَلٰهَا	- তার পশ্চাতে আসে
اَلنَّهَارِ	- দিন, দিবস
جَلّٰهَا	- তাকে প্রকাশ করে
اَلَّيْلِ	- রাত, রাত্রি
يَغْشٰهَا	- তাকে আচ্ছাদিত করে, ঢেকে ফেলে
اَلسَّمَاءِ	- আকাশ, আসমান
مَا	- যিনি, যা
بَنٰهَا	- তৈরি করেছেন, নির্মাণ করেছেন
اَلْاَرْضِ	- জমিন, পৃথিবী
طَحٰهَا	- তা বিস্তৃত করেছেন
نَفْسٍ	- প্রাণ, আত্মা, মানুষ
سَوّٰهَا	- তাকে সুঠাম করেছেন, সুবিন্যস্ত করেছেন
فُجُوْرَهَا	- তার পাপকর্ম, অসৎকর্ম
تَقْوٰهَا	- তার সৎকর্ম
اَفْلَحَ	- সফলকাম হবে, সফলতা লাভ করবে।
زَكّٰهَا	- নিজেকে পবিত্র করবে
خَابَ	- ব্যর্থ হবে
دَسّٰهَا	- নিজেকে কলুষিত করবে
كَذَّبَتْ	- মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, অস্বীকার করেছিল
ثَمُوْدُ	- ছামুদ জাতি
بِطَغْوٰىهَآ	- তাদের অবাধ্যতা দ্বারা
اِذِ	- যখন
اِنْۢبَعَثَ	- তৎপর হয়ে উঠল
اَشْقٰهَا	- তাদের সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি
فَقَالَ	- অতঃপর বললেন
رَسُوْلُ اللّٰهِ	- আল্লাহর রাসুল
نَاقَةَ	- উষ্ট্রী
سُقْيٰهَا	- তাকে পানি পান করানো
فَعَقَرُوْهَا	- অতঃপর তারা তাকে কেটে ফেলল
فَدَمْدَمَ	- অতঃপর ধ্বংস করে দিলেন
بِذَنْۢبِهِمْ	- তাদের পাপের কারণে
لَا يَخَافُ	- তিনি ভয় করেন না
عُقْبٰهَا	- তার পরিণাম

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○	পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।
وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝	১. শপথ সূর্যের ও তার কিরণের।

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝

২. শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝

৩. শপথ দিনের যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝

৪. শপথ রাতের যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে।

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝

৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর।

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝

৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝

৭. শপথ মানুষের এবং যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, তাঁর।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

৮. অতঃপর তিনি তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝

৯. সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে।

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

১০. আর সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝

১১. ছামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল।

اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝

১২. যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝

১৩. তখন আল্লাহর রাসুল তাদের বললেন, আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে (তোমরা সাবধান হও)।

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝

১৪. কিন্তু তারা তাঁকে (রাসুলকে) অস্বীকার করল ও তাকে (উষ্ট্রীকে) কেটে ফেলল। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদের সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

১৫. আর তিনি (আল্লাহ তায়ালা) এর পরিণাম সম্পর্কে ভয় করেন না।

ব্যাখ্যা

সূরা আশ-শামস-এ বর্ণিত আয়াতসমূহ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হলো সূরার প্রথম সাত আয়াত। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কতিপয় সৃষ্টবস্তু, এদের অবস্থা ও এদের স্রষ্টা সম্পর্কে শপথ করেছেন। মানুষের শপথ করেছেন। এসব জিনিসের শপথ করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী

আয়াতগুলোতে বর্ণিত বিষয়ের তাগিদ করেছেন। সূরার দ্বিতীয় ভাগে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিজেকে পাপের দ্বারা কলুষিত করে তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সৎকর্ম করে তার জন্য রয়েছে সফলতা।

সূরার শেষভাগে আল্লাহ তায়ালা ছামুদ সম্প্রদায়ের উদাহরণের মাধ্যমে মানুষের ব্যর্থতার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। ছামুদ সম্প্রদায় ছিল খুবই উন্নত-সমৃদ্ধ একটি জাতি। কিন্তু তারা আল্লাহর প্রেরিত রাসুলকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে। তাদের এ অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং তাদের ধ্বংস করে দেন।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালাই আসমান, জমিন ও মানুষের স্রষ্টা।

২. তিনিই সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিনের আবর্তন ঘটান।

৩. তিনিই মানুষের ভালো-মন্দ, সৎকর্ম-অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেন।

৪. যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে সে সার্বিক সফলতা লাভ করবে।

৫. আর যে ব্যক্তি নিজেকে পাপ পংকিলতায় জড়িয়ে ফেলবে সে ব্যর্থ ও ধ্বংস হবে।

৬. আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা অবাধ্য ছিল আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি প্রদান করেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

সুতরাং আমরা আল্লাহ তায়ালার শাস্তি সম্পর্কে সচেতন থাকব। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। সৎ ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে আমরা নিজেদের পূত-পবিত্র রাখব। তাহলেই আমরা ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা লাভ করতে পারব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আশ-শামস-এর শিক্ষা লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ৭

সূরা আদ-দুহা (سُوْرَةُ الضُّحٰى)

পরিচয়

সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে নাজিল হয়। সূরাটির প্রথম শব্দ দুহা থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আদ-দুহা।

শানে নুযুল

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রাসুলুল্লাহ (স.) অসুস্থ থাকার কারণে দুই-তিন রাত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে পারেননি। এ সময় জিবরাইল (আ.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ওহি নিয়ে

আগমন করেননি। এতে মক্কার কাফির-মুশরিকরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ (স.)-কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছে।

অন্যদিকে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল মহানবি (স.)-এর নিকট এসে বলতে লাগল, "হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয় তোমার নিকট যে শয়তান আসত সে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। দুই-তিন রাত যাবৎ আমি তাকে তোমার নিকট আসতে দেখছি না।" কাফিরদের এসব কথায় ও ঠাট্টা-বিদ্রুপে মহানবি (স.) মর্মাহত হন। তখন আল্লাহ তায়ালা প্রিয়নবি (স.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করে এ সূরা নাজিল করেন। এ সূরার মাধ্যমে কাফিরদের প্রচারিত গুজবের প্রতিবাদও জানানো হয়।

শব্দার্থ

وَ	-	শপথ
اَلضُّحٰى	-	পূর্বাহ্ন, দিনের প্রথম ভাগ
اَلَّيْلِ	-	রাত
اِذَا	-	যখন
سَجٰى	-	অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, নিঝুম হয়
مَا وَدَّعَكَ	-	তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করেননি; ছেড়ে যাননি
مَا قَلٰى	-	তিনি অসন্তুষ্ট হননি, বিরূপ হননি
اَلْاٰخِرَةُ	-	পরকাল, আখিরাত, পরবর্তী সময়, পরজীবন
خَيْرٌ	-	উত্তম, ভালো
لَكَ	-	আপনার জন্য, তোমার জন্য
اَلْاُوْلٰى	-	প্রথম, ইহকাল, দুনিয়ার জীবন, পূর্ববর্তী সময়
سَوْفَ	-	অতি শীঘ্র, অচিরেই
يُعْطِيْكَ	-	তিনি আপনাকে দান করবেন
تَرْضٰى	-	আপনি সন্তুষ্ট হবেন

اَلَمْ يَجِدْكَ	-	তিনি কি আপনাকে পাননি?
يَتِيْمًا	-	ইয়াতীম, অনাথ, আশ্রয়হীন
فَاٰوٰى	-	অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন
وَجَدَ	-	তিনি পেয়েছেন
ضَآلًّا	-	পথ সম্পর্কে অনবহিত
فَهَدٰى	-	অতঃপর তিনি পথ প্রদর্শন করলেন
عَآئِلًا	-	অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব
فَاَغْنٰى	-	অতঃপর ধনী বানালেন, অতঃপর তিনি অভাব দূর করলেন
فَلَا تَقْهَرْ	-	অতএব আপনি কঠোর হবেন না
اَلسَّآئِلَ	-	প্রার্থী, ভিক্ষুক, অভাবী
لَا تَنْهَرْ	-	আপনি ধমক দেবেন না
نِعْمَةِ	-	নিয়ামত, অবদান, ধনদৌলত, অনুগ্রহ
حَدِّثْ	-	আপনি বর্ণনা করুন, প্রচার করুন, প্রকাশ করুন, জানিয়ে দিন

অনুবাদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।
وَالضُّحٰى ۝	১. শপথ পূর্বাহ্নের।
وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى ۝	২. শপথ রাতের, যখন তা নিঝুম হয়।
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝	৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝	৪. নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝	৫. অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।
اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝	৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দান করেছেন।
وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝	৭. তিনি আপনাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন, তারপর তিনি পথের নির্দেশ দিয়েছেন।
وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝	৮. তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর তিনি অভাবমুক্ত করেছেন।
فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝	৯. সুতরাং আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।
وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝	১০. এবং যাচনাকারীকে ধমক দেবেন না।
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝	১১. আর আপনি আপনার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)- কে প্রদত্ত নানা নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ব্যক্তি। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা। মহান আল্লাহ তাঁদের অজস্র নিয়ামত দান করেন। তাঁদের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল। তিনি ছিলেন আল্লাহ তায়ালার হাবিব অর্থাৎ প্রিয়তম বা বন্ধু। আল্লাহ তাঁকে সর্বাবস্থায় সাহায্য ও নিয়ামত দান করেন।

আমরা জানি, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁর ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অসীম রহমতে তাঁকে সুন্দরভাবে লালনপালন করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মানবজাতির দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য ও পরকালীন মুক্তির জন্য চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হিদায়াত দান করেন, সত্য ও সুন্দর পথের নির্দেশনা প্রদান করেন। মহানবি (স.) দরিদ্র ছিলেন। আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে অভাবমুক্ত করেন। সচ্ছলতা দান করেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ (স.)-কে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তায়ালা বহু নিয়ামত দান করেন।

পাশাপাশি পরকালেও আল্লাহ তায়ালা রাসুল (স.)-কে নানা নিয়ামত দান করার সুসংবাদ দান করেছেন এ সূরায়। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, মহানবি (স.)-এর আখিরাতের জীবন দুনিয়ার জীবন অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম হবে। সেখানে তিনি উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

এ সমস্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা রাসুল (স.)-কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেন। রাসুল (স.)-কে ইয়াতীম ও ভিক্ষুকদের সাথে কঠোর ব্যবহার না করার আদেশ দেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রচার করার দায়িত্ব প্রদান করেন।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি। যেমন:

১. আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের কখনোই পরিত্যাগ করেন না।

২. তিনিই তাদের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন।

৩. পরকালে তিনি তাদের কল্যাণময় জীবন দান করবেন।

৪. ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব-দুঃখী, ইয়াতীম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা।

৫. অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী, ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর করা যাবে না এবং তাঁদের ধমকও দেওয়া যাবে না। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

৬. দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও নিয়ামত আল্লাহ তায়ালার দান। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলের কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা আমাদের ইমান, কুরআন, ধন-দৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ামত দান করেছেন। সুতরাং এসবের জন্য আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এসব নিয়ামতের কথা মানুষের মাঝে প্রচার করতে হবে।

কাজ: শিক্ষার্থীরা সূরা আদ-দুহা-এর শানে নুযুল নিজ খাতায় মুখস্থ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৮

সূরা আল-ইনশিরাহ (سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ)

পরিচয়

সূরা আল-ইনশিরাহ মক্কি সূরাসমূহের অন্যতম। এর আয়াত সংখ্যা মোট ৮টি। এটি আল-কুরআনের ৯৪তম সূরা। সূরার প্রথম আয়াতে নাশরাহ (نَشْرَحْ) শব্দের ক্রিয়ামূল বিবেচনায় এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-ইনশিরাহ।

শানে নুযুল

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নবুয়ত লাভের পূর্বেও মক্কা নগরীর অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ ছিলেন। সারা আরবের লোক তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, সম্মান দেখাত। তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকত। নির্দ্বিধায় তাঁর নিকট মূল্যবান ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখত। সর্বোপরি মহানবি (স.) ছিলেন সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু নবুয়ত লাভের পর রাসুলুল্লাহ (স.) ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলে মক্কাবাসীরা তার বিরোধিতা শুরু করে। তারা তাঁকে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করতে থাকে। তাঁকে কবি, গণক, যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে কষ্ট দিতে থাকে। মহানবি (স.) ও নওমুসলিম সাহাবিগণের উপর নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকে। এমনকি নামাযরত অবস্থায় মহানবি (স.)-এর উপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিত, তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, তাঁর কথা না শোনার জন্য কানে আঙুল দিত। এরকম নানাভাবে কাফিররা মহানবি (স.)-কে কষ্ট দিচ্ছিল। কাফিরদের এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যায় অত্যাচারে রাসুলুল্লাহ (স.) উদ্বিগ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে মহানবি (স.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

শব্দার্থ

اَلَمْ نَشْرَحْ	- আমি প্রশস্ত করিনি বা উন্মুক্ত করিনি?
صَدْرَكَ	- আপনার বক্ষ
وَضَعْنَا	- আমি অপসারণ করেছি, সরিয়ে দিয়েছি
وِزْرَكَ	- আপনার বোঝা
اَلَّذِيْ	- যা
اَنْقَضَ	- ভেঙে দিয়েছিল, নুইয়ে দিয়েছিল
ظَهْرَكَ	- আপনার পিঠ বা পৃষ্ঠদেশ
رَفَعْنَا	- আমি উচ্চ করেছি, তুলে ধরেছি
ذِكْرَكَ	- আপনার খ্যাতি, আলোচনা
اِنَّ	- নিশ্চয়ই, অবশ্যই
مَعَ	- সাথে, সঙ্গে
عُسْرٌ	- কষ্ট, বিপদ, অমঙ্গল
يُسْرًا	- স্বস্তি, শান্তি
فَرَغْتَ	- আপনি অবসর লাভ করেন, অবকাশ পান
فَانْصَبْ	- অতঃপর পরিশ্রম করুন, ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুন, একান্তে ইবাদত করুন
فَارْغَبْ	- অনন্তর মনোনিবেশ করুন

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ		পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ	১.	আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি?
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ	২.	এবং আমি আপনার বোঝা অপসারণ করেছি।
الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ	৩.	যা আপনার পৃষ্ঠদেশকে নুইয়ে দিয়েছিল। (যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক)।
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ	৪.	আর আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।
فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ	৫.	নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ	৬.	অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ	৭.	অতএব যখনই আপনি অবসর পান, একান্তে ইবাদত করুন।
وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۙ	৮.	এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

ব্যাখ্যা

এই সূরায় আল্লাহ্ তায়ালা মহানবি (স.)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় আরবদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। তারা নানা প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তারা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কুফরি করত, তাঁকে মানত না এবং তারা মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত ছিল। রাসুলুল্লাহ্ (স.) এসব পছন্দ করতেন না। আরবদের মারামারি, হানাহানি তাঁকে ভীষণভাবে কষ্ট দিত। তাদের এসব অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা চিন্তাক্লিষ্ট থাকতেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এ কষ্ট থেকে মুক্তি দান করেন। তিনি তাঁকে নবুয়ত দান করেন। সত্য পথের দিশা প্রদান করেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ সম্পর্কে নির্দেশনা দান করেন। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি-রাসুল হিসেবে ঘোষণা করেন। নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেন।

নবুয়ত লাভের পর রাসুলুল্লাহ্ (স.) আরবদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। এতে মক্কার কাফিররা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। তারা নানাভাবে তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। তারা মহানবি (স.) ও নও মুসলিম সাহাবিদের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন করতে থাকে। ফলে মুসলমানগণ তাদের অকথ্য জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। আল্লাহ্ তায়ালা এ সময় মহানবি (স.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি

বলেন যে, দুঃখের পরই সুখ আসে। কাফিরদের এসব অত্যাচার নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। বরং তিনি মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। এসব দুঃখকষ্টের পর তারা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-কে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, যখনই ইসলাম প্রচার, সাথিদের প্রশিক্ষণ, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি থেকে তিনি অবসর হন তখনই তিনি যেন আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন।

শিক্ষা

১. যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে খুলে দেন। তাকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন।

২. আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন।

৩. মানুষের মান-সম্মান, খ্যাতি-মর্যাদা সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান মর্যাদা দান করেন।

৪. মানব জীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে।

৫. জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। অতএব, এ সময়কে কাজে লাগাতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

৬. পার্থিব প্রয়োজনীয় কাজ সমাধানের পর আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও স্মরণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সকল কিছুতেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি মনোনিবেশ করা তাঁর প্রিয় বান্দার বৈশিষ্ট্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আল-ইনশিরাহ-এর শিক্ষা সম্পর্কে ৫টি বাক্য শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৯

সূরা আত-তীন (سُوْرَةُ التِّيْنِ)

পরিচয়

সূরা আত-তীন আল-কুরআনের ৯৫তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং এর আয়াত সংখ্যা ৮। সূরার প্রথম শব্দ তীন থেকে এ সূরার নাম আত-তীন রাখা হয়েছে।

শানে নুযুল

বিশেষ কোনো ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাজিল করা হয়নি। বরং মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা ও পরকালের জবাবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত কতিপয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা এতে মানবজাতির উৎপত্তি ও পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ সূরা নাজিল করেন।

শব্দার্থ

وَ	-	শপথ
اَلتِّيْنِ	-	আঞ্জির বা ডুমুর জাতীয় ফল
اَلزَّيْتُوْنِ	-	যায়তুন, জলপাই জাতীয় ফল
طُوْرِ	-	তুর পর্বত
سِيْنِيْنَ	-	সিনাই প্রান্তর
هٰذَا	-	এই
اَلْبَلَدِ	-	শহর, নগর
اَلْاَمِيْنِ	-	নিরাপদ
خَلَقْنَا	-	আমি সৃষ্টি করেছি
اَلْاِنْسَانَ	-	মানুষ, মানবজাতি
اَحْسَنِ	-	অতি সুন্দর
تَقْوِيْمٍ	-	আকৃতি, গঠন, অবয়ব
ثُمَّ	-	অতঃপর, পুনরায়, অনন্তর
رَدَدْنٰهُ	-	আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি-
اَسْفَلَ	-	সর্বনিম্ন
اِلَّا	-	ব্যতীত, তবে, ছাড়া
اَلَّذِيْنَ	-	যারা
اٰمَنُوْا	-	তারা ইমান এনেছে
عَمِلُوْا	-	তারা আমল করেছে
اَلصّٰلِحٰتِ	-	সৎকর্মসমূহ
اَجْرٌ	-	প্রতিদান
غَيْرُ مَمْنُوْنٍ	-	অশেষ, অবারিত
مَا يُكَذِّبُكَ	-	কিসে তোমাকে অবিশ্বাসী করে?
اَلدِّيْنِ	-	কর্মফল দিবস, বিচার দিবস, কিয়ামত দিবস, জীবন-বিধান
اَحْكَمِ	-	শ্রেষ্ঠতম বিচারক
اَلْحٰكِمِيْنَ	-	বিচারকগণ

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ○ ১. শপথ আঞ্জির ও যায়তুনের।

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ○ ২. আর শপথ সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের।

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ○ ৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা নগরীর)।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۙ○ ৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ○ ৫. এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝	৬.	কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার।
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۝	৭.	সুতরাং (হে মানুষ!) কিসে তোমাকে বিচার দিবস সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۝	৮.	আল্লাহ কি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

ব্যাখ্যা

সূরা আত-তীনের প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম দুটি হলো আঞ্জির (ডুমুর জাতীয় ফল) ও যায়তুন। আঞ্জির হলো একটি উপাদেয় ফল। আর যায়তুনের ফল অত্যন্ত বরকতময় ও এর তৈল খুবই উপকারী। এ দুটি বৃক্ষ সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চলে বেশি উৎপন্ন হয়। আর সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে অগণিত নবি- রাসুল আগমন করেছিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তুর পর্বতের শপথ করেছেন। এ পর্বত অত্যন্ত বরকতময় স্থান। এ পর্বতে হযরত মুসা (আ.) মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন করেন। আর সেখানেই তাওরাত কিতাব নাজিল হয়। তৃতীয় আয়াতে নিরাপদ নগরীর শপথ করা হয়েছে। আর এটা হলো মক্কা নগরী। এ নগরীতে মহানবি (স.) জন্মগ্রহণ করেন। এতে পবিত্র বায়তুল্লাহ বা কাবা শরিফ অবস্থিত, সেখানে রক্তপাত ও মারামারি নিষিদ্ধ।

এ সূরায় প্রথম তিনটি আয়াতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন। সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

এ সূরার শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এ সূরায় সৎকর্মশীল ও পুণ্যবানগণের জন্য পরকালে জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পরকালে আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য একত্র করবেন। এদিন হবে প্রতিফল দিবস বা শেষ বিচারের দিন। আল্লাহ তায়ালা হবেন সেদিনের একমাত্র বিচারক। তিনিই সর্বোত্তম ন্যায়বিচারক। মানুষের দুনিয়ার কৃতকর্মের জন্য তিনি পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।

শিক্ষা

১. মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি।

২. মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। অসৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যায়।

৩. সৎকর্মশীলগণ পরকালে অশেষ ও অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করবেন।

৪. আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। শেষ বিচারের দিন তিনি সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। ২০২৫

মহান আল্লাহ আখিরাত সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি সাবধান ও সতর্ক করেছেন। সুতরাং কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষের এটি অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আত-তীন-এর অনুবাদ নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০

সূরা আল-মাউন (سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ)

পরিচয়

সূরা আল-মাউন আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৭টি। এটি মাক্কি সূরাগুলোর অন্তর্গত। সূরার শেষ শব্দ মাউন থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

اَرَءَيْتَ	-	আপনি কি দেখেছেন?	الْمِسْكِيْنِ	-	মিসকিন, নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত
الَّذِىْ	-	যে	فَوَيْلٌ	-	অতঃপর ধ্বংস, দুর্ভোগ
يُكَذِّبُ	-	অস্বীকার করে, মিথ্যারোপ করে	لِّلْمُصَلِّيْنَ	-	সালাত আদায়কারীগণ
الدِّيْنِ	-	কর্মফল দিবস, বিচার দিবস, ধর্ম	سَاهُوْنَ	-	উদাসীন, অবহেলাকারী
يَدُعُّ	-	তাড়িয়ে দেয়	يُرَآءُوْنَ	-	তারা দেখায়
الْيَتِيْمَ	-	ইয়াতীম, অনাথ	يَمْنَعُوْنَ	-	তারা দেয় না
لَا يَحُضُّ	-	উৎসাহ দেয় না	الْمَاعُوْنَ	-	গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু, নিত্যব্যবহার্য বস্তু।
طَعَامِ	-	খাদ্য, আহার			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ — পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ — ১. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে?

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ — ২. সে তো ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ — ৩. আর সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝	৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের।
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝	৫. যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝	৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝	৭. এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু অন্যকে দেয় না।

ব্যাখ্যা

এই সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সূরার প্রথম আয়াতে কিয়ামত দিবস ও বিচার দিবস অস্বীকারকারীদের কথা বলেছেন। আর কাফির মুনাফিকরাই মূলত বিচার দিবসের অস্বীকারকারী। তারা তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার করে।

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যেমন, তারা ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর, ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ তারা জোর করে দখল করে। ইয়াতীমদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতার পরিবর্তে তাদের রূঢ় ও নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে দেয়। এমনকি ইয়াতীম, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে নিজেরা তো সাহায্য করেই না বরং অন্যকেও একাজে উৎসাহ দেয় না।

মুনাফিকদের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা ঠিকমতো সালাত আদায় করে না। বরং তারা সালাত সম্পর্কে উদাসীন। শুধু মুসলমানদের দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে তারা কোনো খবর রাখে না। অথচ সালাতে অবহেলার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

শিক্ষা

১. বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ। এটি কাফির-মুনাফিকদের কাজ।

২. ইয়াতীম ও দুঃস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

৩. ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে।

৪. কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে।

৫. সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আল-মাঊন-এর শিক্ষা একটি পোস্টারে লিখে বাড়ি থেকে তৈরি করে আনবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাহ

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ। সুন্নহ অর্থ পথ, পদ্ধতি, রীতিনীতি। ইসলামি পরিভাষায়, মহানবি (স.)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে। সুন্নাহকে হাদিস নামেও অভিহিত করা হয়। সুন্নাহ হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আর মহানবি (স.) তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে এসব বিধি-বিধান ও বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

অর্থ : "আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪)

একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে- أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ

অর্থ : "তোমরা সালাত কায়েম কর।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত ৭২)

কিন্তু কোথায়, কীভাবে, কোন সময়ে সালাত আদায় করতে হবে এর কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আল-কুরআনে পাওয়া যায় না। বরং রাসুলুল্লাহ (স.) এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সালাতের সমস্ত নিয়মকানুন তাঁর হাদিস বা সুন্নাহ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে আল-কুরআনের নির্দেশ ও সুন্নাহর বর্ণনার মাধ্যমে সালাত প্রতিষ্ঠা হয়।

মূলত সুন্নাহ বা হাদিস হলো আল-কুরআনের পরিপূরক। আল-কুরআনে একে শরিয়তের দলিল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন - وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থ : "আর রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর তোমাদের যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাহ বা হাদিস শরিয়তের অন্যতম দলিল ও উৎস। আল-কুরআনের পরই এর স্থান।

আল-হাদিস

হাদিস অর্থ কথা বা বাণী। ইসলামি পরিভাষায়, হাদিস বলতে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (স.) যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন দিয়েছিল, তা সবই হাদিস। হাদিসের দুটি অংশ: একটি সনদ (سَنَدٌ) ও অপরটি মতন (مَتْنٌ)। হাদিসের রাবি পরম্পরাকে সনদ বলা হয়। যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাঁকে বলা হয় রাবি বা বর্ণনাকারী। হাদিস বর্ণনায় হাদিসের রাবিগণের পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ বা বর্ণনা পরম্পরাই সনদ (سَنَدٌ)। আর হাদিসের মূল বক্তব্য বা মূল অংশকে বলা হয় মতন (مَتْنٌ)। হাদিস শাস্ত্রে সনদ ও মতন উভয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকারভেদ

মতন বা হাদিসের মূল বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে হাদিসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. কাওলি (قَوْلِيٌّ), খ. ফে'লি (فِعْلِيٌّ) এবং গ. তাকরিরি (تَقْرِيْرِيٌّ)

ক. কাওলি হাদিস

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণীসূচক হাদিসকে কাওলি হাদিস বলা হয়। অর্থাৎ মহানবি (স.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে কাওলি বা বাণীসূচক হাদিস বলে।

খ. ফে'লি হাদিস

ফে'লি শব্দের অর্থ কাজ সম্বন্ধীয়। যে হাদিসে মহানবি (স.)-এর কোনো কাজের বিবরণ স্থান পেয়েছে তাকে ফে'লি বা কর্মসূচক হাদিস বলা হয়।

গ. তাকরিরি হাদিস

তাকরিরি অর্থ মৌন সম্মতি জ্ঞাপক। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অনুমোদনসূচক হাদিসই হলো তাকরিরি হাদিস। অর্থাৎ সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সামনে কোনো কথা বলেছেন কিংবা কোনো কাজ করেছেন কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.) তা নিজে করেননি এবং তাতে বাধাও দেননি বরং মৌনতা অবলম্বন করে তাতে সম্মতি বা অনুমোদন দিয়েছেন। এরূপ অবস্থা বা বিষয়ের বর্ণনা যে হাদিসে এসেছে সে হাদিসকে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

সনদ বা রাবির পরম্পরার দিক থেকে হাদিস আবার তিন প্রকার। যথা- (ক) মারফু (اَلْمَرْفُوْعُ), (খ) মাওকুফ (اَلْمَوْقُوْفُ) ও (গ) মাকতু (اَلْمَقْطُوْعُ)।

ক. মারফু হাদিস

যে হাদিসের সনদ রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

খ. মাওকুফ হাদিস

যে হাদিসের সনদ সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে, রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছেনি এরূপ হাদিসকে মাওকুফ হাদিস বলে।

গ. মাকতু হাদিস

যে হাদিসের সনদ তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতু হাদিস বলে। অন্যকথায়, যে হাদিসে কোনো তাবিঈর বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতি বর্ণিত হয়েছে তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, শরিয়তে আরও বহু প্রকারের হাদিস দেখা যায়। আমরা পরবর্তীতে এগুলো সম্পর্কে জানব।

হাদিসের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো হাদিসে কুদসি। কুদস শব্দের অর্থ পবিত্র। এ প্রকার হাদিস সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামি পরিভাষায়, যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিজস্ব, কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, তাকে

হাদিসে কুদসি বলে। সংক্ষেপে, যে হাদিসের মূল কথা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মহানবি (স.) নিজের ভাষায় তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন সেটাই হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসির ভাব, অর্থ ও মূলকথা আল্লাহ্ তায়ালার হলেও তা আল-কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি হাদিস হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে সাধারণভাবে হাদিস বলা হয়। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স.) থেকেই হাদিসের উৎপত্তি। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় প্রথম দিকে হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল। কেননা তখন আল-কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় মহানবি (স.)-এর হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের বাণীর সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় ব্যাপকভাবে হাদিস লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়নি।

তবে সাহাবিগণ মহানবি (স.)-এর বাণীসমূহ মুখস্থ রাখতেন। রাসুলুল্লাহ (স.) কোন সময় কী কাজ করতেন তা খেয়াল রাখতেন। আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁরা একবার যা স্মৃতিতে ধারণ করতেন কখনোই তা ভুলতেন না। ফলে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর প্রতিটি বাণী ও কাজ সাহাবিগণের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হতো। রাসুলুল্লাহ (স.)ও স্বয়ং তাঁদের হাদিস মুখস্থ করার জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির জীবন উজ্জ্বল করবেন, যে আমার কথা শুনে তা মুখস্থ করল ও সঠিকরূপে সংরক্ষণ করল এবং এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দিল যে তা শুনতে পায়নি।" (তাবারানি)। সাহাবিগণ রাসুল (স.)-এর কথা শুনতেন, তা মনে রাখতেন এবং তা হুবহু বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছে দিতেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশাতেই হাদিস সংরক্ষণ শুরু হয়।

তা ছাড়া লিখিত আকারেও সেসময় বেশ কিছু হাদিস সংরক্ষিত হয়। বহু সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অনুমতিক্রমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাদিস লিখে রাখতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.)-এর সহিফা 'আস-সাদিকা'-এর কথা উল্লেখযোগ্য। এ সহিফাতে তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বহুসংখ্যক হাদিস লিখে রেখেছিলেন। তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চিঠিপত্র, সন্ধিপত্র-চুক্তিনামা, সনদ, ফরমান ইত্যাদি লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল।

হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযিয (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম সরকারিভাবে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে নতুন গতি সঞ্চার হয়। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত ইমাম মালিক (র.) সর্বপ্রথম হাদিসের বিশুদ্ধ সংকলন তৈরি করেন। তাঁর এ গ্রন্থের নাম আল-মুয়াত্তা।

হিজরি ৩য় শতক ছিল হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ সময় হাদিসের বিশুদ্ধতম ছয়টি কিতাব সংকলিত হয়। এগুলোকে একত্রে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ বলা হয়। এ ছয়টি গ্রন্থ এবং এদের সংকলকগণের নাম :

১. সহিহ্ বুখারি - ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি (র.)

২. সহিহ মুসলিম - ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (র.)

৩. সুনানে নাসাই - ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসাই (র.)

৪. সুনানে আবু দাউদ - ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআস (র.)

৫. জামি তিরমিযি - ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি (র.)

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ - ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ (র.)।

হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিস হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। এটিও এক প্রকার ওহি। মহানবি (স.) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েই মানুষকে নানা বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করতেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

অর্থ : "আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন- নাজম, আয়াত ৩-৪)

সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী ও কাজের অনুসরণ করা আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আনুগত্য করলে প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ তায়ালা এতে সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আপনি বলুন! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তো কাফিরদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩২)

আল-হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান ও মূলনীতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর নবি (স.)-এর দায়িত্ব ছিল এসব বিধি-বিধান স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪)

রাসুলুল্লাহ (স.) কুরআনের বিধি-বিধানসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজে আমল করার দ্বারা এসব বিধান হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এসব বাণী ও কর্মই হাদিস। সুতরাং কুরআনের বিধি-বিধান সুস্পষ্টরূপে অনুসরণের জন্য হাদিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ : "আর রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

আর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদেশ-নিষেধ এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের জন্যও হাদিস জানা অত্যাবশ্যক। কেননা হাদিসের মাধ্যমেই আমরা এসব বিষয় জানতে পারি। মহানবি (স.) স্বয়ং হাদিসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ -

অর্থ : "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং অপরটি তাঁর রাসুলের সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা)

প্রকৃতপক্ষে, কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের সর্বপ্রধান দুটি উৎস। এগুলো মানুষকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথে পরিচালনা করে। এ দুটোর শিক্ষা ও আদর্শ ত্যাগ করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং মানবজীবনে আল-কুরআনের পাশাপাশি মহানবি (স.)-এর হাদিসের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ বা হাদিস-এর পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ নিজ খাতায় বাড়ি থেকে লিখে আনবে।

মহানবি (স.)-এর ১০টি হাদিস

পাঠ ১২

হাদিস ১

(নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

إِنَّمَا - প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত, আসলে

اَلْأَعْمَالُ - আমলসমূহ, কর্মসমূহ

اَلنِّيَّاتُ - নিয়ত, সংকল্প, উদ্দেশ্য।

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ : "প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারি)

ব্যাখ্যা

এই হাদিসটি সহিহ্ বুখারির সর্বপ্রথম হাদিস। এর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের সকল কাজই নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিয়ত বা উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ কোনো কাজই করে না। কাজের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব এ হাদিস দ্বারা বুঝতে পারা যায়। সাথে সাথে কোন কাজের উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত তাও এ হাদিসের তাৎপর্য বিশ্লেষণে জানা যায়।

আল্লাহ্ তায়ালা পরকালে মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সেদিন তিনি মানুষের সকল কাজের নিয়ত বা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। বরং নিয়ত সঠিক না হওয়ায় সে ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়।

উপরে বর্ণিত হাদিসটির শেষাংশে জানলে আমরা নিয়তের বিশুদ্ধতার বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারব। এ হাদিসের শেষাংশে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নিয়তে (তাঁদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য) হিজরত করে তবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর যদি সে পার্থিব লাভ বা কোনো স্ত্রীলোককে বিয়ে করার জন্য হিজরত করে তবে সে শুধু তাই লাভ করবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে।

রাসুলুল্লাহ (স.) বিশেষ এক প্রেক্ষাপটে এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। আর তা হলো- উম্মে কায়েস নামক একজন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বিয়ে করার জন্য মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন। ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য জানতে পেরে নবি (স.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। যার মূল বক্তব্য হলো- আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়ত না থাকায় লোকটি হিজরতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলেন।

শিক্ষা

১. কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে নিয়ত বলা হয়।

২. নিয়তের উপরেই কাজের সফলতা নির্ভর করে। অর্থাৎ নিয়ত যদি ভালো হয় তবে ব্যক্তি উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। আর নিয়ত যদি খারাপ হয় তবে ভালো কাজ করলেও ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করবে না।

৩. আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ করেন।

সুতরাং সকল কাজেই আমরা নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখব। লোক দেখানোর জন্য বা পার্থিব কোনো লাভের আশায় সৎকর্ম করব না, বরং আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি অনুবাদসহ লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

হাদিস ২

[ইসলামের ভিত্তি (ইমান, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ) সম্পর্কিত হাদিস]

শব্দার্থ

بُنِىَ	-	ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত	وَ	-	এবং, ও, আর
عَلٰى	-	উপর	اِقَامِ	-	কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা
خَمْسٍ	-	পাঁচ	اَلصَّلٰوةِ	-	সালাত, নামায
شَهَادَةِ	-	সাক্ষ্য দেওয়া, সাক্ষ্য	اِيْتَاءِ	-	প্রদান করা, আদায় করা
اِلَّا	-	ব্যতীত, ছাড়া	اَلزَّكٰوةِ	-	যাকাত
عَبْدُهٗ	-	তার বান্দা	صَوْمِ	-	সাওম, রোযা
رَسُوْلُهٗ	-	তার রাসুল	رَمَضَانَ	-	রমযান মাস

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

অর্থ : "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) তার বান্দা ও রাসুল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।" (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে মহানবি (স.) ইসলামের পাঁচটি মূলভিত্তি একসাথে বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো ইমান, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। এ পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না।

এই হাদিসে মহানবি (স.) উপমার মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, ইসলাম হলো একটা তাঁবু সদৃশ ঘর। ইমান হলো তাঁবুর মধ্যস্থিত মূল খুঁটি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মধ্যস্থিত খুঁটি ছাড়া তাঁবু দাঁড় করানো অসম্ভব। তাঁবুর বাকি চারটি খুঁটিও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। সবগুলো খুঁটি ঠিক থাকলে তাঁবু ঠিকভাবে দণ্ডায়মান থাকে। এর কোনো একটি খুঁটি না থাকলে তাঁবু ভূলুণ্ঠিত হয়। সুতরাং ইসলামের পূর্ণতার জন্য এ পাঁচটি ভিত্তির সবকটিই গুরুত্বপূর্ণ। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম ব্যক্তি এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

শিক্ষা

১. ইসলামের মূলভিত্তি পাঁচটি । এগুলো হলো- ঈমান, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম ।

২. ঈমান হলো সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ।

৩. ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে ঈমানের প্রকাশ ঘটাতে হবে ।

৪. অতঃপর অন্যান্য ভিত্তি যথা- সালাত, যাকাত, হজ ও সাওমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে ।

৫. এ পাঁচটি ভিত্তির একটি ছাড়াও ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না ।

পাঠ ১৪

হাদিস ৩

(দানশীলতা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

يَوْمٌ	দিন	اَللّٰهُمَّ	হে আল্লাহ!
يُصْبِحُ	সকালে উপনীত হয়	اَعْطِ	তুমি দান কর
اَلْعِبَادُ	বান্দাগণ	مُنْفِقًا	খরচকারী, দানকারী
مَلَكَانِ	দুজন ফেরেশতা	خَلَفًا	প্রতিদান
يَنْزِلَانِ	দুজন নাজিল হন, তারা দুজন অবতরণ করেন ।	مُمْسِكًا	আটককারী, কৃপণ
اَحَدُهُمَ	তাদের মধ্যে একজন	تَلَفًا	ক্ষতি

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ
الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -

অর্থ : "বান্দাগণ প্রতিদিন সকালে উপনীত হলেই দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন । এঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তুমি তার প্রতিদান দাও । আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! সম্পদ আটককারীকে (কৃপণকে) ক্ষতিগ্রস্ত কর ।" (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

মানবজীবনে অর্থের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে এ হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দানশীলতার পুরস্কার ও কৃপণতার কুফল সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা ও দানশীলতা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। নানাভাবে একাজ করা যায়। সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য খরচ করাও একপ্রকার দানশীলতা। তাছাড়া গরিব, অভাবী, ইয়াতীম, দুঃস্থ, ফকির-মিসকিনকে সাহায্য করাও সকলের কর্তব্য। দান করার মাধ্যমে মানুষের ইমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাহ্যিকভাবে এতে দেখা যায় যে, সম্পদ কমে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে সম্পদ কমে না। বরং আল্লাহ্ তায়ালা খুশি হয়ে দানশীলকে আরও প্রভূত পরিমাণে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তার অবশিষ্ট সম্পদে বরকত হয়। আসমানের ফেরেশতা প্রতিদিন সকালে তার পক্ষে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করেন।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সম্পদ খরচ না করে জমা করে রাখে সে কৃপণ। তার সম্পদ কোনো কাজে আসে না। এতে কোনোরূপ কল্যাণ ও বরকত নেই। আসমানের ফেরেশতাগণও তার প্রতি বদদোয়া করেন। এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে কৃপণ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিক্ষা

১. দানশীলতা মহৎ গুণ।

২. দানশীল ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা দানশীলকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

৩. কৃপণতা নিন্দনীয় কাজ। কৃপণ ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব, আমরা দানশীল হব। গরিব, দুঃখী, অভাবীদের সাহায্য করব। নিজ পিতা-মাতা, ভাইবোনদের জন্য খরচ করব। এতে আল্লাহ্ তায়ালা খুশি হবেন এবং আমাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা দানশীলতা সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা মুখস্থ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৫

হাদিস ৪

(বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

مُسْلِمٍ	-	মুসলিম, মুসলমান	مِنْهُ	-	তা থেকে
يَغْرِسُ	-	রোপণ করে	طَيْرٌ	-	পাখি

غَرْسًا - বৃক্ষ		اِنْسَانٌ - মানুষ	
يَزْرَعُ - আবাদ করে, চাষ করে		بَهِيْمَةٌ - চতুষ্পদ জন্তু	
زَرْعًا - ফসল		اِلَّا - ছাড়া, ব্যতীত	
يَأْكُلُ - ভক্ষণ করে, খায়		صَدَقَةٌ - সদকা, দান	

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ-

অর্থ : "কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বর্ণনায় হাদিসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ হাদিসে মহানবি (স.) আমাদের বৃক্ষরোপণ ও কৃষি কাজ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর দ্বারা মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ঔষধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি লাভ করি। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। আলোচ্য হাদিসে বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে মহানবি (স.) আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আমরা অনেকেই বৃক্ষরোপণ বা কৃষিকাজকে ছোট কাজ বলে ঘৃণা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজই ছোট নয়। সৎভাবে করা সকল কাজই উত্তম। বৃক্ষরোপণেও কোনো লজ্জা নেই। বরং এটি অনেক নেকির কাজ। স্বয়ং মহানবি (স.) আমাদের এ কাজে উৎসাহিত করেছেন।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব লাভের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণও লাভ করতে পারে। কেননা পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ বৃক্ষের ফল, ক্ষেতের ফসল খেয়ে থাকে। এতে বৃক্ষরোপণকারী ও ফসল আবাদকারী সাওয়াব লাভ করে। ঐ ফল-ফসল সদকা করে দিলে যে সাওয়াব হতো, পশুপাখি বা মানুষের খাওয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় সে পরিমাণ সাওয়াব লিখে দেন। ফলে সে নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়।

শিক্ষা

১. বৃক্ষরোপণ পুণ্যের কাজ।

২. বৃক্ষরোপণের দ্বারা মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়। পরিবেশ সংরক্ষিত থাকে। পাশাপাশি আখিরাতেও প্রতিদান পাওয়া যাবে।

৩. মহানবি (স.) আমাদের বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

৪. মানুষের উৎপাদিত ফল, ফসলে পশু-পাখি ও অন্য মানুষেরও হক রয়েছে।

৫. উৎপাদিত ফল, ফসল থেকে কোনো প্রাণী কিছু ভক্ষণ করলে তা বিনষ্ট হয় না। বরং তা সদকা হিসেবে আবাদকারীর আমলনামায় লেখা হয়।

> কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলবে।
> খ. প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ বাড়িতে একটি করে গাছ রোপণ করবে এবং শিক্ষককে তা জানাবে।
> গ. শ্রেণি শিক্ষক সব ছাত্র/ছাত্রীকে নিয়ে বিদ্যালয়ের মাঠে একটি বৃক্ষরোপণ করে শিক্ষার্থীদের বাস্তবে বৃক্ষরোপণের প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিতে পারেন।

পাঠ ১৬
হাদিস ৫

(সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

أُنَبِّئُكُمْ	আমি তোমাদের খবর দেব	اَلَّذِيْنَ	যারা
خِيَارِكُمْ	তোমাদের মধ্যে উত্তম	إِذَا	যখন
قَالُوْا	তাঁরা বললেন	رُءُوْا	দেখা হয়
بَلٰى	হ্যাঁ	ذُكِرَ	স্মরণ হয়।

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ إِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ : রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "আমি কি তোমাদের ভালো লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! হ্যাঁ, বলে দিন। তিনি বললেন- তোমাদের মধ্যে ভালো লোক তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।" (ইবনে মাজাহ)

২০১৫

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) সবচেয়ে উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। বস্তুত সর্বোত্তম মানুষ হলেন তাঁরা, যাঁদের দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়। ঐসব ব্যক্তি চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদে ইসলামের একান্ত অনুসারী। তাঁরা সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকেন। এরূপ লোকদের দেখলেই আল্লাহর স্মরণ এসে যায়। মানুষের মধ্যে এসব লোকই সর্বোত্তম।

সমাজে আমরা বহু লোকের সাথে চলাফেরা করি। তাদের সকলকে দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয় না। সুতরাং যাঁদের দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এতে তাঁদের প্রভাব আমাদের উপরও পড়বে। আমরাও তাদের ভালো কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হব। আমাদের চলাফেরা, উঠাবসা, আচার-আচরণ সুন্দর হবে। ফলে আমরাও উত্তম মানুষে পরিণত হতে পারব।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালার স্মরণ সর্বোত্তম কাজ।

২. মানুষের মর্যাদা ধন-দৌলত, শিক্ষা বা ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং দীন পালনের মাধ্যমেই মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয়।

৩. যাঁদের দেখলে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হয় তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি।

আমরা দীনদার লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখব। তাঁদের মতো হতে চেষ্টা করব।

পাঠ ১৭

হাদিস ৬

(মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

اَلْخَلْقُ	- সৃষ্টিজগৎ, মাখলুক, সমগ্র সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল	مَنْ	- যে
عِيَالٌ	- পরিজন, আপনজন	اَحْسَنَ	- অনুগ্রহ করে, সদাচরণ করে
اَحَبُّ	- অধিক প্রিয়, সর্বাধিক প্রিয়	اِلٰى	- প্রতি, দিকে

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ-

অর্থ : "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।" (বায়হাকি)

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি হলেন খালিক। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে সবই তাঁরই সৃষ্টি বা মাখলুক। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টি তেমনি কীটপতঙ্গও তাঁর মাখলুক। বস্তুত জিন-ইনসান, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, তরুলতা, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল কিছুর লালনকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি সকল সৃষ্টিকে এক রকম করে সৃষ্টি করেননি। এটা তাঁর পরীক্ষা। তিনি সৃষ্টিকুলকে নানাভাবে ভাগ করেছেন এবং সকল কিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা, সকল মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা। পশু-পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি অনুগ্রহ করা। এদের প্রতি অনুগ্রহ করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। যাঁরা আল্লাহ তায়ালার এসব সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করেন তাঁরা মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ভালোবাসেন।

শিক্ষা

১. সকল সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পরিজন স্বরূপ।

২. এদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সদাচরণ করা ইসলামের আদর্শ।

৩. জীবজন্তু, পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন।

৪. সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করার দ্বারা মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হতে পারে।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা লিখে পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৮

হাদিস ৭

(পরোপকার সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

أَخٌ	-	ভাই	حَاجَةٌ	-	প্রয়োজন
لَا يَظْلِمُهُ	-	সে তার প্রতি অত্যাচার করে না	أَخِيهِ	-	তার ভাই
لَا يُسْلِمُهُ	-	তাকে সোপর্দ করে না			

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ

অর্থ : "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করে না, তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।" (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। তারা সকলে একই আদর্শে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী। ফলে পৃথিবীর যে স্থানেই কোনো মুসলমান থাকুক না কেন সকলেই ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এতে দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির কোনো ভেদাভেদ নেই। ধনী-গরিব, সাদা-কালো, আরব-অনারব সকল মুসলমানই পরস্পর ভাই-ভাই। সুতরাং এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি বেশকিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না ও জুলুম-নির্যাতন করা যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। তার জান, মাল, ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করতে হবে। শত্রুর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে হবে। তার শত্রুকে সাহায্য করা যাবে না। ছোট-বড় যেকোনো প্রয়োজনে অপর মুসলমান ভাইকে সাধ্যমতো সাহায্য করতে হবে। সামর্থ্য থাকলে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় বুদ্ধি পরামর্শ ও সৎ উপদেশের মাধ্যমে সাহায্য করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমেও তাকে সাহায্য করতে হবে।

বস্তুত নিজের সামর্থ্যানুযায়ী আন্তরিকভাবে অপর মুসলমান ভাইয়ের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে। এতে আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। তিনি স্বয়ং সাহায্যকারীকে সাহায্য করেন। তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

শিক্ষা

১. মুসলমানগণ পরস্পর ভাই-ভাই।

২. তারা পরস্পর অন্যায় অত্যাচার করবে না।

৩. শত্রুর মোকাবিলায় সকলে একত্রে এগিয়ে আসবে।

৪. বিপদে আপদে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

৫. সাহায্যকারী মুসলিম আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রিয়। আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পরোপকার সম্পর্কিত হাদিসটির অনুবাদ ও শিক্ষা লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৯
হাদিস ৮

(ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

اَلتَّاجِرُ	ব্যবসায়ী, বণিক	اَلشُّهَدَاءُ	শহিদগণ, শাহাদাত লাভকারীগণ
اَلْاَمِيْنُ	বিশ্বস্ত	مَعَ	সঙ্গে, সাথে
اَلصَّدُوْقُ	সত্যবাদী	يَوْمَ	দিবস, দিন

اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : "বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন।" (ইবনু মাজাহ)

ব্যাখ্যা

ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। আমাদের প্রিয়নবি (স.)ও ব্যবসা করেছেন। সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ীগণ শহিদগণের সঙ্গে অবস্থান করবেন। সেদিন তাঁদের কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না। বরং তাঁরা সেদিন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হবেন। শহিদগণ হলেন ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা প্রদান করেছেন। সৎ ব্যবসায়ীগণও কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হবেন। তাঁরাও শহিদগণের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

তবে এজন্য ব্যবসায়ীদের দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। **প্রথমত,** সততা ও সত্যবাদিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** তাদেরকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে হবে। অর্থাৎ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করলে কিয়ামতের দিন মহাপুরস্কার লাভ করা যাবে। অন্যদিকে, ব্যবসায় প্রতারণা করলে, মিথ্যা বললে এ কল্যাণ লাভ করা যাবে না। সুতরাং ব্যবসা ক্ষেত্রে সকল প্রকার অন্যায় ও খারাপ কাজ ত্যাগ করতে হবে। লোভ-লালসা পরিত্যাগ করতে হবে। ওজনে কম দেওয়া, খারাপ দ্রব্য ভালো বলে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করা, মজুদদারি, কালোবাজারি প্রভৃতি অনৈতিক কাজ করা যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই কিয়ামতে শহিদগণের সঙ্গী হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করা যাবে।

শিক্ষা

১. ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল পেশা। তবে তা ইসলামি নীতি আদর্শের অনুসরণে করতে হবে।

২. ব্যবসায়ে সততা ও বিশ্বস্ততা মহৎ গুণ। সকলকেই এগুলোর অনুশীলন করতে হবে।

৩. বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হবেন।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা হাদিসটি আরবিতে লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২০
হাদিস ৯

(ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

عَجَبًا	-	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক
اَلْمُؤْمِنِ	-	মুমিন, ইমানদার
اَمْرَهُ	-	তার কাজ
خَيْرٌ	-	কল্যাণ, ভালো
اِلَّا	-	ব্যতীত, ছাড়া
اَصَابَتْهُ	-	তার নিকট পৌছায়
ضَرَّاءُ	-	দুঃখ-কষ্ট, বিপদ
صَبَرَ	-	ধৈর্যধারণ করে
سَرَّاءُ	-	খুশি, আনন্দ
شَكَرَ	-	শুকরিয়া আদায় করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে
لَهُ	-	তার জন্য

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ -

অর্থ : "মুমিনের কাজ বিস্ময়কর। আর প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় তবে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে মানবজীবনের নানা অবস্থায় কিরূপ আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে সুন্দর দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানবজীবনে সুখ-শান্তির পাশাপাশি দুঃখ-কষ্টও বিদ্যমান। এগুলো আল্লাহ্ তায়ালার পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ্ তায়ালা সুখ ও দুঃখের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা করে থাকেন। মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি এরূপ করে থাকেন। ফলে সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। কেননা দুঃখ কষ্টে নিপতিত হলে মুমিন ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়েন না। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য অন্যায় কাজ করেন না। বরং এ অবস্থাতেও তিনি আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করেন ও ধৈর্যসহকারে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেন। এতে আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাকে সাওয়াব দান করেন এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। ফলে দুঃখ-কষ্টের অবস্থাও মুমিন ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।

আর সুখ-শান্তির অবস্থাতেও মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে যান না। বরং তিনি সুখ-শান্তি ও নিয়ামতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার শোকর করেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর খুশি হন ও তাঁর নিয়ামতসমূহ আরও বাড়িয়ে দেন। ফলে এ অবস্থায় মুমিন ব্যক্তি সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করেন।

শিক্ষা

১. সুখ-দুঃখ মানবজীবনের স্বাভাবিক বিষয়।

২. দুঃখ-কষ্টের সময় হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করতে হবে।

৩. আনন্দের সময়ও আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ ভুলে গেলে চলবে না। বরং তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৪. এভাবে সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শোকর ও সবরের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করা যায়।

৫. মুমিন ব্যক্তির সকল কাজই কল্যাণজনক। কেননা, মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করেন। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্ বিমুখ হন না। ফলে সবর ও শোকরের মাধ্যমে তিনি সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করেন। প্রকৃত মুমিন হতে হলে আমাদেরকে সদা সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিসটির অনুবাদ ও শিক্ষা নিজ খাতায় লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২১
হাদিস ১০

(যিকির সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

كَلِمَتَانِ	-	দুটি বাক্য
حَبِيْبَتَانِ	-	খুবই প্রিয়
اَلرَّحْمٰنِ	-	দয়াময়
خَفِيْفَتَانِ	-	খুবই সহজ
اَللِّسَانِ	-	জিহ্বা
ثَقِيْلَتَانِ	-	খুবই ভারী
اَلْمِيْزَانِ	-	দাঁড়িপাল্লায়
سُبْحَانَ	-	মহা পবিত্র
بِحَمْدِهٖ	-	তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা
اَلْعَظِيْمِ	-	মহামহিম

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ-

অর্থ : দুটি বাক্য এমন রয়েছে যা দয়াময় আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, উচ্চারণ করতে সহজ ও দাঁড়িপাল্লায় খুবই ভারী। বাক্য দুটি হলো "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম" (আল্লাহ মহাপবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম)। (বুখারি)

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে মহানবি (স.) উম্মতকে দুটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো হলো :

প্রথম বাক্য : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি

দ্বিতীয় বাক্য : সুবহানাল্লাহিল আযিম

রাসুলুল্লাহ (স.) ছিলেন উম্মতের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী। এজন্য তিনি আমাদের অতীব বরকতময় এ দুটি যিকির শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর ফজিলতও বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত, এ বাক্যদ্বয় আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কেননা এতে মহান আল্লাহর পবিত্রতা, মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা বাংলাভাষী। আরবি আমাদের মাতৃভাষা নয়। তথাপি এ বাক্যদ্বয় খুবই সুন্দর ও সাবলীল। আমরা খুব সহজেই এগুলো উচ্চারণ করতে পারি, মুখস্থ করতে পারি। এগুলো উচ্চারণে কোনোরূপ জিহ্বার আড়ষ্টতা সৃষ্টি হয় না, কোনোরূপ কষ্ট হয় না। বস্তুত এ দুটো সহজ সরল ও সুন্দর বাক্য।

তৃতীয়ত, এ বাক্যদ্বয় মিযানে বা দাঁড়িপাল্লায় খুবই ভারী হবে। কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কৃতকর্ম দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। নেকির পাল্লা ভারী হলে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর নেকির পাল্লা হালকা হলে তার স্থান হবে জাহান্নাম। এ বাক্যদ্বয়ের সাওয়াব ওজনে খুবই ভারী। মিযানে এগুলো নেকির ওজনকে ভারী করে তুলবে।

অতএব, আমরা এ বাক্য দুটো মুখস্থ করব এবং সব সময় পাঠ করব। ফলে মহামহিম ও মহাপবিত্র আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং অধিক পরিমাণ প্রতিদান দেবেন।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালা মহাপবিত্র, মহামহিম। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করলে তিনি খুশি হন।

২. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম- আল্লাহ তায়ালার প্রিয় দুটি বাক্য। আমরা সদা সর্বদা এ বাক্যদ্বয়ের যিকির করব।

৩. হাশরের দিন মিযানে এ বাক্যদ্বয় খুবই ভারী হবে। ফলে এর পাঠকারী সফলতা লাভ করবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে পোস্টারে আরবিতে একটি হাদিস লিখে এনে শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ২২
শরিয়তের তৃতীয় উৎস : আল-ইজমা

পরিচয়

শরিয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা। ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। ইজমা মহানবি (স.)-এর পরবর্তী যেকোনো যুগে হতে পারে। সাহাবিগণ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইজমা কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি বিরোধী কিংবা কোনো অন্যায় ও পাপ কাজে ইজমা হয় না। ইজমা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা ও নিয়ামত।

ইজমার উৎপত্তি

ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো সমস্যার সমাধান করা কিংবা নতুন বিধান প্রবর্তন করা কোনো নতুন ঘটনা নয়। বরং রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সময় হতেই এর ব্যবহার বা প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবিগণের পরামর্শ নিতেন। অতঃপর তাঁদের মতামতের আলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

অর্থ : "আর তাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।" (সুরা আশ-শুরা, আয়াত ৩৮)

এভাবেই রাসুলুল্লাহ (স.) ইজমার বৈধতা, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সাহাবিগণের যুগে এর পূর্ণাঙ্গ প্রচলন ঘটে। খলিফাগণ নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সর্বপ্রথম আল-কুরআনে এর সমাধান খুঁজতেন। তাতে খুঁজে না পেলে মহানবি (স.)-এর হাদিসের মাধ্যমে সমাধান করতেন। আর যদি হাদিসেও সে সমস্যার সুস্পষ্ট কোনো সমাধান না পেতেন তখন তাঁরা বিশিষ্ট সাহাবিগণের মতামত নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান দিতেন। যেমন- হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে সাহাবিগণের ঐকমত্যের মাধ্যমেই কুরআন সংকলনের কাজ শুরু করা হয়। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর সময়ে বিশ রাকআত তারাবি-এর সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবিগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পরবর্তী যুগগুলোতেও ইজমার মাধ্যমে নানা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা হয়েছে।

ইজমার হুকুম ও কার্যকারিতা

ইজমা শরিয়তের তৃতীয় উৎস। বিধি-বিধান নির্ধারণে ইজমা অকাট্য দলিল হিসেবে সাব্যস্ত। সাধারণভাবে ইজমার ভিত্তিতে প্রণীত বিধানের উপর আমল করা ওয়াজিব।

ইজমার গুরুত্ব ও বৈধতা

ইসলামি শরিয়তে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআন ও হাদিসের পরই এর স্থান। এটি শরিয়তের তৃতীয় উৎস ও অকাট্য দলিল। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস দ্বারা ইজমার বৈধতা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থ : "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব।" (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

অর্থ : "আর এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পার।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৪৩)

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে উম্মতে মুহাম্মদি তথা মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠ ও মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইজমার পরোক্ষ দলিল স্বরূপ।

মুসলিম মুজতাহিদগণ একমত হয়ে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করলে তার বিরোধিতা করা চরম পাপ। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

অর্থ : "আর সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও কেউ যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনগণের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, তবে আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।" (সুরা আন-নিসা, আয়াত ১১৫)

উক্ত আয়াতে মুমিনদের অনুসৃত পথ বলতে মুসলিমদের ঐকমত্য বা ইজমা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.) বলেছেন-

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ-

অর্থ : "মুসলমানগণ যা ভালো বলে মনে করে তা আল্লাহ্ তায়ালার নিকটও ভালো।" (তাবারানি)

এ হাদিস দ্বারাও ইজমা তথা মুসলমানদের ঐকমত্যের গুরুত্ব প্রমাণিত।

মহানবি (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তায়ালা আমার উম্মতকে নিশ্চয়ই গোমরাহির উপর জমায়েত করবেন না। আল্লাহর হাত (রহমত ও সাহায্য) দলবদ্ধ থাকার উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে (অবশেষে) দোযখে যাবে।" (তিরমিযি)

ইজমা শরিয়তের অন্যতম দলিল। এর বৈধতা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এর বিধানের উপর আমল করা আবশ্যক।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আল-ইজমার পরিচয়, উৎপত্তি ও গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাড়ি থেকে লিখে আনবে এবং শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২৩

শরিয়তের চতুর্থ উৎস : আল-কিয়াস

পরিচয়

শরিয়তের চতুর্থ উৎস হলো কিয়াস। কিয়াস শব্দের অর্থ অনুমান করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। অন্য কথায়, কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমাতে যে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না, ইসলামি মূলনীতি অনুযায়ী বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে সমস্যার সমাধান করাই হলো কিয়াস।

কিয়াসের গুরুত্ব

কিয়াস ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উৎস। ইজমার পরই এর স্থান। ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানবজীবন ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকেই করতে হয়। ইসলাম অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এসব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। কেননা, ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। এটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন জীবন-বিধান। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে শরিয়তের বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন এগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সর্বযুগে সর্বকালে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। আর এ পদ্ধতির নামই কিয়াস। সুতরাং শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াস অপরিহার্য।

আল-কুরআন ও হাদিসে কিয়াসকে শরিয়তের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ ○

অর্থ: "অতএব হে চক্ষুষ্মানগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ২)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের চিন্তা ও গবেষণা করে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কিয়াস মুসলিম জ্ঞানীদের চিন্তা–ভাবনারই ফল।

কিয়াস শরিয়তের সর্বনিম্ন স্তর। যখন কোনো বিষয়ে আল-কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পরিষ্কারভাবে সমাধান পাওয়া যায় না তখনই কিয়াস প্রযোজ্য হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণকে কিয়াস করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহানবি (স.) যখন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে তখন তুমি কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে?' হযরত মুআয (রা.) বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুসারে। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, 'যদি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও, তবে?' তিনি বললেন, তাহলে নবির সুন্নাহ মোতাবেক। রাসুল (স.) পুনরায় বললেন, 'যদি তাতেও না পাও, তাহলে?' হযরত মুআয (রা.) বললেন, তা হলে আমি আমার বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করব। তাঁর উত্তর শুনে নবি (স.) বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর রাসুলের দূত দ্বারা এমন উত্তর প্রদান করালেন যাতে তাঁর রাসুল সন্তুষ্ট হলেন।" (আবু দাউদ)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদিসে স্পষ্টভাবে কিয়াস বা গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং কিয়াস যে শরিয়তের অন্যতম উৎস এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিয়াসের নীতিমালা

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে কিয়াসের মাধ্যমে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা হতো। পরবর্তী যুগে কিয়াসের ব্যবহার আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। তবে নিজের খেয়ালখুশি মতো স্বার্থপরভাবে কিয়াস করা বৈধ নয়। শরিয়তের ইমামগণ কিয়াস করার ব্যাপারে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলো হলো:

ক. যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পাওয়া যায় সেসব বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না।

খ. কিয়াস কখনোই কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধী হবে না।

গ. কিয়াসের পদ্ধতি ও আইন মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।

ঘ. কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত আইনের মূলনীতি বিরোধী কোনো আইন তৈরি করা কিয়াসের আওতা বহির্ভূত।

প্রকৃতপক্ষে কিয়াস ইসলামি শরিয়তের একটি বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক উৎস। কিয়াস ইসলামি আইনকে গতিশীল করেছে ও সর্বজনীনতা দান করেছে। এর মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বায়নের নতুন নতুন বিষয়ের বিধান দেওয়া সম্ভব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আল-কিয়াস-এর পরিচয়, গুরুত্ব ও নীতিমালা সম্পর্কে ১৫টি বাক্য বাড়ি থেকে লিখে আনবে এবং শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২৪

শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা

শরিয়ত হলো ইসলামি বিধি-বিধানের সমন্বিত রূপ। পরিভাষায় শরিয়ত বলতে এমন সুদৃঢ় সোজাপথকে বুঝায় যার দ্বারা তার অবলম্বনকারী ব্যক্তি হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপন্থা লাভ করতে পারেন। আর আহকাম হলো বিধানাবলি।

প্রতিটি বিষয়েরই নিজস্ব কিছু পরিভাষা থাকে। ইসলামি শরিয়তেরও এরূপ বেশ কিছু পরিভাষা বিদ্যমান। এসব পরিভাষার মাধ্যমে শরিয়তের বিধানাবলির পর্যায়ক্রমিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ইসলামি শরিয়তের আহকাম বা বিধানাবলি সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, মুবাহ ইত্যাদি। এ পাঠে আমরা উল্লিখিত পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব।

ফরজ

ফরজ (فَرْضٌ) অর্থ অবশ্য পালনীয়, অত্যাবশ্যক। শরিয়তের যেসব বিধান কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা অবশ্য কর্তব্য ও অলঙ্ঘনীয় বলে প্রমাণিত তাকে ফরজ বলা হয়।

ফরজ কাজ কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যায় না। ফরজ অস্বীকার করলে ইমান থাকে না। আর এগুলো পালন না করলে কবিরা গুনাহ বা মারাত্মক পাপ হয়। ফরজ কাজ পালন না করলে আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

ফরজ দুই প্রকার। যথা- ১. ফরজে আইন
২. ফরজে কিফায়া

১. ফরজে আইন

যে সকল ফরজ বিধান সকলের উপর পালন করা অত্যাবশ্যক তাকে ফরজে আইন বলে। অর্থাৎ যেসব ফরজ কাজ ব্যক্তিগতভাবে সকল মুসলমানকেই আদায় করতে হয় তা-ই ফরজে আইন। যেমন- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, রমযান মাসে রোযা রাখা, এসব কাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজে আদায় করতে হয়।

২. ফরজে কিফায়া

ফরজে কিফায়া হলো সামষ্টিকভাবে ফরজ কাজ। অর্থাৎ যেসব কাজ মুসলমানের উপর ফরজ, কিন্তু সমাজের কতিপয় মুসলমান যদি আদায় করে ফেলে তবে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। কিছু লোকের আদায় করার দ্বারা সমাজের বাকি সবাই সে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়। তবে যদি সমাজের কেউই আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন- জানাযার সালাত। কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ঐ এলাকার সবার উপর তার জানাযার সালাত আদায় করা ফরজ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের কতিপয় মুসলমান যদি তার জানাযার সালাত আদায় করে ফেলে তবে সকলেই এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। কিন্তু কেউই যদি মৃতব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় না করে তবে সকলেই ফরজ ত্যাগের কারণে গুনাহগার হবে।

ওয়াজিব

ওয়াজিব অর্থ : অবশ্য পালনীয়, কর্তব্য, অপরিহার্য ইত্যাদি। শরিয়তের এমন কিছু বিধান রয়েছে যা পালন করা কর্তব্য। তবে ফরজ নয়। এরূপ বিধানকে ওয়াজিব বলা হয়।

শরিয়তে ফরজের পরই ওয়াজিবের স্থান। এটি ফরজের কাছাকাছি। অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত না হলেও এটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ওয়াজিব অস্বীকার করলে মানুষ কাফির হয় না। তবে সে বড় রকমের অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। ওয়াজিব কাজ আদায় না করলেও কঠিন পাপ হয়। এর জন্য আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। ইসলামি শরিয়তে বহু ওয়াজিব কাজ রয়েছে। যেমন- দুই ঈদের সালাত, বিতরের সালাত ইত্যাদি। সালাত আদায়ের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু ওয়াজিব কাজ রয়েছে। যেমন- সূরা ফাতিহা পড়া, রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সিজদাহর মধ্যে সোজা হয়ে বসা ইত্যাদি। সালাতের এসব ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সিজদাহ সাহ্ দিতে হয়। নতুবা সালাত শুদ্ধ হয় না। পুনরায় তা আদায় করতে হয়।

সুন্নত

সুন্নত অর্থ- পথ, পন্থা, রীতি, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি। পরিভাষায় মহানবি (স.) থেকে যে সমস্ত কাজ ইসলামি শরিয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় সুন্নত। অর্থাৎ যে সকল কাজ মহানবি (স.) নিজে করেছেন বা যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা অনুমোদন করেছেন তাকে সুন্নত বলা হয়। সুন্নত দুই প্রকার। যথা-

১. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

২. সুন্নতে যায়িদাহ।

১. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

যে সকল কাজ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে সর্বদাই পালন করতেন, অন্যদেরকে তা পালনের তাগিদ দিতেন তাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলে। যেমন- আযান ও ইকামত দেওয়া, ফজরের ফরজ নামাযের পূর্বে দুই রাকআত, যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিব ও এশার ফরজের পর দুই রাকআত নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ওয়াজিবের কাছাকাছি। এগুলো পালন করা কর্তব্য। ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত বিনা কারণে এগুলো পালন না করলে গুনাহ হয়।

২. সুন্নতে যায়িদাহ

সুন্নতে যায়িদাহ হলো অতিরিক্ত সুন্নত। পরিভাষায়, যে সকল কাজ নবি (স.) করেছেন বলে প্রমাণিত তবে তিনি সর্বদা তা পালন করতেন না, বরং কখনো করতেন আবার কখনো ছেড়ে দিতেন এসব কাজকে সুন্নতে যায়িদাহ বলা হয়। মহানবি (স.) এরূপ কাজ করার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি তাগিদ করেননি এবং তা না করলে গুনাহ হয় না। সুন্নতে যায়িদাহকে সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহও বলা হয়। যেমন- আসর ও এশার ফরজের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত নামায আদায় করা। সুন্নতে যায়িদাহ পালনে অনেক সাওয়াব অর্জন করা যায়।

মুস্তাহাব

মুস্তাহাব অর্থ পছন্দনীয়। যে সকল কাজের প্রতি রাসুলুল্লাহ (স.) উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং তা করলে নেকি পাওয়া যাবে, কিন্তু না করলে গুনাহ হবে না সেসব কাজকে শরিয়তে মুস্তাহাব বলে।

ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত ব্যতীত অতিরিক্ত সবধরনের ইবাদত ও ভালো কাজই মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য। এ মুস্তাহাবকে নফল বা মানদুবও বলা হয়।

মুবাহ

যে সকল কাজ করলে কোনোরূপ সাওয়াব নেই, আবার না করলে কোনোরূপ গুনাহও হয় না এরূপ কাজকে মুবাহ বলা হয়। মানুষ ইচ্ছা করলে এরূপ কাজ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা না-ও করতে পারে।

হালাল-হারাম

পার্থিব জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষাগার। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যই এ বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন-

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ

অর্থ : "তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্য এ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৯)

আর এ সবকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষা করা। এজন্য আল্লাহ তায়ালা সৃষ্ট বস্তুর কিছু কিছু হালাল করে দিয়েছেন আর কিছু কিছু বস্তুকে হারাম করে দিয়েছেন। যেসব বস্তু মানুষের জন্য সামগ্রিকভাবে

কল্যাণকর সেগুলোকে হালাল করেছেন। আর যেসব বস্তু মানুষের জন্য অকল্যাণকর তা হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর নবি-রাসুলও আসমানি কিতাবের মাধ্যমে হালাল-হারামের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের উচিত হালালকে গ্রহণ করা ও যাবতীয় হারাম বস্তু ও কাজকে বর্জন করা। এ পাঠে হালাল ও হারাম সম্পর্কে আমরা জানতে চেষ্টা করব।

হালাল

হালাল অর্থ- বৈধ, সিদ্ধ, আইনানুগ বা অনুমোদিত বিষয়। এছাড়া পবিত্র, গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি অর্থেও হালাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইসলামি পরিভাষায় যে সকল বিষয়ের বৈধ হওয়া কুরআন-হাদিস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত, শরিয়তে তাকে হালাল বলা হয়। হালাল কথা, কাজ বা বস্তু সবই হতে পারে। যেমন- যেসব বস্তু বা দ্রব্য ব্যবহার করা শরিয়তে বৈধ তা হালাল দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। যেমন- গরুর গোশত, চাল-ডাল, ফলমূল আহার করা, শালীন ও রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি। তেমনি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স.) যেসব কথা বা কাজের অনুমতি দিয়েছেন সেগুলো হালাল কাজ হিসেবে স্বীকৃত। যেমন- সত্য কথা বলা, সুন্নত সম্মত পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা, মানুষের উপকার করা ইত্যাদি।

হারাম

হারাম হলো হালালের বিপরীত। হারাম অর্থ নিষিদ্ধ, মন্দ, অসংগত, অপবিত্র ইত্যাদি। পরিভাষায় যে সকল কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য, বর্জনীয় তাকে হারাম বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স.) যেসব কাজ করতে বা যেসব বস্তু ব্যবহার করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন সেসব কাজ বা বস্তু মানুষের জন্য হারাম। যেমন সুদ, ঘুষ, জুয়াখেলা, শূকরের গোশত খাওয়া, মদ পান করা ইত্যাদি হারাম।

হালাল-হারামের সংখ্যা

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে হালাল ও হারাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মহানবি (স.) বলেছেন-

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ -

অর্থ : "হালাল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। আর হারামও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত।" (বুখারি ও মুসলিম)

পৃথিবীতে হালাল জিনিস বা বস্তু অগণিত। এর কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এগুলো আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত হিসেবে চিহ্নিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

অর্থ : "আর তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে চাও তবে গুনে তা শেষ করতে পারবে না।" (সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৪)

শরিয়তের ভাষ্য অনুযায়ী আকিদা ও ইবাদত ব্যতীত প্রত্যেক বিষয় মুবাহ বা বৈধ। তবে এর বিপক্ষে কুরআন ও হাদিসে যদি কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় তবে তা হারাম হবে। সুতরাং বোঝা গেল যে, হালালের সংখ্যা অগণিত। আর হারাম বস্তুর সংখ্যা সীমিত।

এসব হালাল ও হারাম বিষয়গুলো চিনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা হালালকে হারাম মনে করা ও হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করা কুফর। যেহেতু হারাম সীমিত সংখ্যক, সেহেতু নিম্নে বর্তমান সমাজে প্রচলিত কতিপয় হারাম বিষয় ও দ্রব্যের তালিকা উল্লেখ করা হলো:

১. মৃত জীবজন্তু খাওয়া (তবে মৃত মাছ খাওয়া হারাম নয়)।
২. রক্ত পান করা (তবে হালাল জন্তুর গোশতে লেগে থাকা রক্ত হারাম নয়)।
৩. মানুষের গোশত খাওয়া।
৪. শূকরের গোশত খাওয়া।
৫. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গীকৃত কিংবা জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া।
৬. মদ্যপান করা।
৭. মাদকদ্রব্য যেমন- হেরোইন, ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা, আফিম সেবন করা।
৮. গলা টিপে বা উঁচু থেকে ফেলে দিয়ে হত্যাকৃত পশুর গোশত খাওয়া।
৯. হিংস্র প্রাণী যেমন- বাঘ, সিংহ, ভালুক ইত্যাদির গোশত খাওয়া।
১০. বিষাক্ত ও ক্ষতিকর প্রাণীর গোশত খাওয়া। যেমন- সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি।
১১. যেসব প্রাণী ময়লা ও নাপাক দ্রব্য খেয়ে বাঁচে তাদের গোশত খাওয়া। যেমন- কাক, শকুন, কুকুর ইত্যাদি।
১২. গাধা, খচ্চর, হাতি ইত্যাদির গোশত খাওয়া।
১৩. সুদ, ঘুষ ও জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ।
১৪. চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জিত দ্রব্য।
১৫. অবৈধ পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন।
১৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা হলফ করা, গিবত, গালি-গালাজ করা।
১৭. সর্বোপরি অশ্লীল, অশালীন ও মানুষকে কষ্টদায়ক সকল দ্রব্য, কথা ও কাজ।

প্রকৃতপক্ষে, কুরআন ও সুন্নতে নিষেধকৃত সকল বস্তুই হারাম। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা সকল মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য।

মানবজীবনে হালালের প্রভাব

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কোনটা উপকারী ও কোনটা অপকারী। যেসব দ্রব্য ও বিষয় মানুষের জন্য কল্যাণকর আল্লাহ তায়ালা তা হালাল করে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ز

অর্থ : "হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৬৮) হালাল বস্তু গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত গ্রহণ করে এবং সর্বোচ্চ কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

হালাল দ্রব্য মানুষকে ইবাদতে উৎসাহিত করে। মানুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে পারে। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ

অর্থ : "হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর।" (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ৫১)

হালাল ও পবিত্র দ্রব্য মানুষের দেহ ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখে। অন্তরে নূর সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ অন্যায় ও অসৎ চরিত্রকে ঘৃণা করতে থাকে। মানুষ সৎগুণাবলি সম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে। বস্তুত হালাল খাদ্য মানুষের মধ্যে পবিত্র ভাব ও আত্মশুদ্ধির উদ্রেক করে। ফলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

মানবজীবনে হারামের প্রভাব

মানব জীবনে হারাম বস্তু, কথা ও কাজের পরিণাম ও কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। কোনো কোনো হারাম দ্রব্যের মধ্যে এমন উপাদান বিদ্যমান থাকে যা মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও শরীরের জন্য চরম ক্ষতিকর। এগুলো অনেক সময় মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত করে। এমনকি অনেক মারাত্মক ও প্রাণনাশক রোগ সৃষ্টি করে। যেমন- মদ, গাঁজা, হেরোইন ইত্যাদি।

তা ছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হিংস্র প্রাণীর দেহে এমন সব জীবাণু আছে যা মানুষের দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

হারাম কাজ মানবসমাজেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন- সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারি ইত্যাদি। এতে সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হয়, নৈতিক মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়, সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়, অনেকে সর্বস্বান্ত ও দেউলিয়া হয়ে যায়। এমনকি অনেকে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

হারাম খাদ্যদ্রব্য মানুষের অন্তরে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ অন্যায়, অশ্লীলতা ও অসৎচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানব চরিত্রের সৎগুণাবলি নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ ইবাদতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার ইবাদত-দোয়া কবুল হয় না। মহানবি (স.) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তার দু'হাত তুলে আল্লাহর নিকট বলতে থাকে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! কিন্তু তার পানাহার হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম। সুতরাং এমতাবস্থায় তার দোয়া কীভাবে কবুল হতে পারে?" (মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (স.) অন্য হাদিসে বলেছেন- "যে শরীর হারামের মাধ্যমে গঠিত, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।" (আহমাদ, বায়হাকি ও দারিমি)

প্রকৃতপক্ষে, হারাম মানুষকে অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং আমরা সদা সর্বদা হারামের ব্যাপারে সতর্ক থাকব। সকল কথা, কাজ ও পানাহারে হালাল পন্থা গ্রহণ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. لَا تَقْهَرْ (লা-তাক্‌হার) অর্থ কী?

ক. ধমক দেবেন না খ. নিষেধ করবেন না

গ. আশ্রয় দেবেন না ঘ. কঠোর হবেন না।

২. ওহি লেখক সাহাবিদের সংখ্যা কত ছিল ?

ক. ২৮ খ. ৪২

গ. ৪৭ ঘ. ৮৬।

৩. মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্যে বর্ণনা করা হয়েছে –

i. শিরক-কুফরের পরিচয়

ii. মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা

iii. শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪, ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আলম সাহেব গ্রামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার সকল সম্পদ দখল করে ছোট ভাইয়ের সন্তানদের বাড়ি থেকে বের করে দেন।

৪. আলম সাহেবের কাজের মাধ্যমে কাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে ?

ক. গরিবদের খ. অসহায়দের

গ. ইয়াতীমদের ঘ. বঞ্চিতদের।

৫. আলম সাহেবের কাজের মাধ্যমে শরিয়তের কোন উৎসের বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে ?

ক. কুরআন খ. হাদিস

গ. ইজমা ঘ. কিয়াস।

৬. শরিয়তের দৃষ্টিতে আলম সাহেব হবেন .... ।

ক. ফাসিক খ. কাফির

গ. মুনাফিক ঘ. যালিম।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাজিব ও সাজিদ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাজিব প্রায়ই ফজরের সালাত সূর্যোদয়ের পর এবং আসরের সালাত সূর্যাস্তের সময় আদায় করে। সাজিদ এলাকার যুবকদের সত্য কথা বলা ও নিয়মিত সালাত আদায় করার জন্য আহ্বান জানালে কতিপয় যুবক তার কথা শুনে কটূক্তি করে। যুবকদের অত্যাচার অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছলে সে শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়, শিক্ষক কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে শোনান–

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

ক. 'ফারগাব' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি'– বুঝিয়ে লেখ।

গ. সাজিবের কাজের মাধ্যমে কাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাজিদের কার্যক্রম চিহ্নিত করে তোমার পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। নাসির ও জাবির সাহেব দুই বন্ধু। নাসির সাহেব তার বাড়ির চারপাশে অনেক ফলের গাছ লাগিয়েছেন। মানুষেরা সেই গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে এবং পাখিরা ফল খায়। নাসির সাহেব প্রতিবেশীদেরও ফল দেন। আর জাবির সাহেবের দোকানে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় হয়। কোনো ভেজাল নেই। তাই অনেক মানুষ রমযান মাসে তার দোকানে বাজার করে।

ক. শরিয়তের তৃতীয় উৎসের নাম কী?

খ. হারাম বর্জনীয় কেন?

গ. নাসির সাহেবের কাজটি কী হিসেবে গণ্য হবে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাবির সাহেবের কাজের ফলাফল ইসলামের আলোকে মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ মহান আল্লাহর আদেশ যেমন- সালাত, সাওম, হজ, যাকাত পালন করা এবং নিষেধ যেমন- সুদ, ঘুষ, বেপর্দা, বেহায়াপনা ইত্যাদি পরিহার করে চলাকে ইবাদত বলে। তেমনিভাবে নবি ও রাসুলের দেখানো পথ অনুযায়ী একে অপরের সাথে উত্তম আচার ব্যবহার করাও ইবাদত। মূলত ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) ও হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) এর ধারণা লাভ করবো এবং এগুলো আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) ও হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) চিহ্নিত করে বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারব;
- সালাতের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- সাওমের (রোযার) গুরুত্ব ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- যাকাতের ভূমিকা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হজের ধারণা ও নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিকতা অর্জনে হজের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- অসহায় ও দরিদ্রের অধিকার বর্ণনা করতে পারব;
- মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইলম (জ্ঞান) এর ধারণা, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষকের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং শিক্ষা ও নৈতিকতার ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- জিহাদের ধারণা, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব এবং সন্ত্রাসবাদের কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য অনুধাবন করে সন্ত্রাসমুক্ত মানবতাবাদী জীবনযাপনে সচেষ্ট হতে পারব;
- মৌলিক ইবাদতগুলো পালনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনে অগ্রসর হতে পারব।

পাঠ ১

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো চূড়ান্তভাবে দীনতা-হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া। আর ইসলামি পরিভাষায়, দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান

মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে সহজভাবে জীবনযাপন করার জন্য অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন।

আমরা আল্লাহর বান্দা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

অর্থ : "আর আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।" (সূরা আল-বাইয়্যিনা, আয়াত ০৫)

কীভাবে ইবাদত করলে ও জীবনযাপন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন, তা শেখানোর জন্য নবি-রাসুলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অনুসরণ করতে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "(হে নবি!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তো কাফিরদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৩২)

উক্ত আয়াত থেকে আমরা বুঝলাম আল্লাহ ও তার রাসুল কর্তৃক নির্দেশিত পথ ও মত অনুসরণ করার নাম ইবাদত। সুতরাং তাঁদের নির্দেশিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারলে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হব।

ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য হলো বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানের। যদি মানুষ সে বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে না পারে তাহলে সে চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তার চেয়েও অধম হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ আছে তা দ্বারা শুনে না; এরা পশুর ন্যায়। বরং অধিক নিকৃষ্ট (পশু হতে); তারা হলো অচেতন।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৭৯)। অতএব ইবাদত বলতে শুধু উপাসনাকেই বুঝায় না। বরং আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে সকল কার্য আল্লাহর বিধানমতো করাই হলো ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থ : "সালাত আদায় করার পর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ব্যাপৃত হবে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ১০)

এ আয়াতের মর্ম থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর আদিষ্ট কাজগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায় করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও কৃষিকাজ করা এবং বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও দুনিয়ার অন্যান্য সকল ভালো কাজ করা ইবাদত। এমনিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রহমতের আশা, শাস্তির ভয়, ইখলাস, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সব কাজই ইবাদতের মধ্যে শামিল।

আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর প্রদর্শিত পন্থা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে পরকালে আল্লাহ আমাদের পুরস্কৃত করবেন। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা শান্তি পাব।

হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ

ইবাদত প্রধানত দুই প্রকার : (ক) হাক্কুল্লাহ ও (খ) হাক্কুল ইবাদ।

(ক) হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক)

আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ (حَقُّ اللهِ) বলে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য অনেক ধরনের ইবাদত (কাজ) করি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট, এগুলো হলো হাক্কুল্লাহ, যেমন- সালাত (নামায) কায়েম করা, সাওম (রোযা) পালন ও হজ করা ইত্যাদি। এসব কাজ করার পূর্বে প্রত্যেক মানুষকে অন্তর থেকে যা বিশ্বাস করতে হবে তা হলো- আল্লাহ আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক (অংশীদার) নেই, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। তাঁর আদেশেই পৃথিবীর সবকিছু আবার ধ্বংস হবে। আমাদের জীবন-মৃত্যু সবই তাঁর হাতে। পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তাঁর হাতেই সকল সৃষ্টির রিজিক। আমরা তাঁরই ইবাদতকারী। তিনি ব্যতীত উপাসনার উপযুক্ত আর কেউ নেই। এ সবকিছু মনে প্রাণে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করাই হলো বান্দার উপর আল্লাহর হক।

আল্লাহর হক আদায় করতে হলে আমাদের অবশ্যই নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে :

১. সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা।
২. আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।
৩. সর্বাবস্থায় নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ এবং তাঁর অনুগ্রহ কামনা করা।

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আল্লাহর বিধানগুলো মেনে চলব; তাতে তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। ফলে আমরা পরকালে তাঁর থেকে পুরস্কার পাব।

(খ) হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। আমরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করি। একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া দেই। আপদে-বিপদে একে-অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করি। পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হাক্কুল ইবাদ (حَقُّ الْعِبَادِ) (বান্দার হক বা অধিকার)। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, ইসলামে বান্দার হক তথা মানবাধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মানবাধিকার সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক রয়েছে। অন্যত্র রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন, "এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন- সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া।" (বুখারি ও মুসলিম)

মানুষের প্রতি মানুষের হক বা অধিকারকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন : (১) নিকটাত্মীয়ের হক, (২) দূরাত্মীয়ের হক, (৩) প্রতিবেশীর হক, (৪) দেশবাসীর হক, (৫) শাসক-শাসিতের হক, (৬) সাধারণ মুসলমানের হক, (৭) অভাবী লোকের হক এবং (৮) অমুসলিমের হক।

আমরা আল্লাহর হক পালন করার সাথে সাথে মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হব।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কিত প্রতিটির উপর তিনটি করে উদাহরণ তৈরি করবে।

পাঠ ২
সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

পরিচয়

সালাত আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো নামায। এর অর্থ দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত (দয়া) কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া করে, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তাই একে সালাত বলা হয়। ইসলাম যে পাঁচটি রুকনের (স্তম্ভের) উপর প্রতিষ্ঠিত তার দ্বিতীয়টি হলো সালাত। এ সম্পর্কে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

অর্থ : "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল; (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা; (৩) যাকাত দেওয়া; (৪) রমযানের রোযা রাখা; (৫) হজ করা।" (সহিহ বুখারি)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেবেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ-

অর্থ : "কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে।" (তিরমিযি)

মহান আল্লাহ মুমিনের উপর দৈনিক পাঁচওয়াক্ত সালাত ফরজ (আবশ্যক) করেছেন। তা হলো-ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। সালাত একজন মুমিনকে (বিশ্বাসী) মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ

২০২৫

তায়ালা বলেন-

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

অর্থ : "নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সুরা আল-'আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ব্যতীত কখনোই সালাত ত্যাগ করা যাবে না।

ধর্মীয় গুরুত্ব

একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। ইমান মজবুত হয়, আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। মানুষকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে অভ্যস্ত করে তোলে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মনোযোগসহ সালাত আদায় করে, কিয়ামতের দিন ঐ সালাত তার জন্য নূর হবে।" (তাবারানি)

একদা হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথিদের লক্ষ্য করে বললেন- 'যদি কারও বাড়ির পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয় এবং কোনো লোক দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?' সাহাবিগণ উত্তরে বললেন, 'না' হে আল্লাহর রাসুল! তখন মহানবি (স.) বললেন- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিক তেমনি তার (সালাত আদায়কারীর) গুনাহসমূহ দূর করে দেয়। (বুখারি ও মুসলিম) মহানবি (স.) আরও বলেছেন, "সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী।" (তিরমিযি)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "জামাআতে সালাত আদায় করলে একাকী আদায় করার চাইতে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।" (বুখারি ও মুসলিম)

আর আল্লাহ তায়ালাও সালাতকে জামাআতের সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

অর্থ : "আর তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৩)

সামাজিক গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচবার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। একে-অপরের খোঁজ-খবর নিতে পারে। সুখে-দুঃখে একে অপরের সহযোগিতা করতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। এমনকি সালাতের সারিতে দাঁড়াতে গিয়ে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ফলে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি হয়। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক সকল মতপার্থক্য ভুলে একসাথে কাজ করার শিক্ষা পায়।

সালাত আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়। নেতার অনুসরণ করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে নিয়মিত সালাত আদায় করব। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা গ্রুপভিত্তিক সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্বের উপর পাঁচটি করে বাক্য তৈরি করবে।

পাঠ ৩

সাওম (اَلصَّوْمُ)

পরিচয়

সাওম আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো- সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। আমাদের দেশে সাওমকে রোযাও বলা হয়ে থাকে।

প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষের উপর রমযান মাসের এক মাস সাওম পালন করা ফরজ। এটি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাওমের শিক্ষা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

সাওমের নৈতিক শিক্ষা

সাওম কেবল আমাদের উপরই ফরজ নয়। বরং পূর্বের নবি-রাসুলের উম্মতের উপরও ফরজ ছিল। এর মাধ্যমে সাওম পালনকারীর আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মানুষ মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে কিছুই পানাহার করে না ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে না।

মহান আল্লাহ বলেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থ : "তোমাদের উপর সাওম (রোযা) ফরজ করা হয়েছে। যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া (আল্লাহ্ ভীতি) অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৩)

আমরা তাকওয়া অর্জনের জন্য রমযান মাসে সিয়াম পালন করব।

মানুষ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-ক্ষোভ ও কামভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। সাওম মানুষকে এসব কাজ থেকে মুক্ত থাকতে শেখায়। সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মাঝে ঢাল স্বরূপ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ

অর্থ : "সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ।" (বুখারি ও মুসলিম)

সর্বোপরি সাওম পালনের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়।

সাওমের সামাজিক শিক্ষা

সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালন করে এরূপ ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার ফলে সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। এতে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "এ মাস সহানুভূতির মাস।" (ইবনে খুযায়মা)

সাওম অসহায় ও দরিদ্রকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করে। রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ (স.) অন্যদের দান-সদকা করতে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছেন, তিনি নিজেও তেমনিভাবে খুব দান-সদকা করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "রাসুলুল্লাহ (স.) লোকদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন। বিশেষ করে রমযান এলে তার দানশীলতা আরও বেড়ে যেত।" (বুখারি ও মুসলিম)

সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব

ধর্মীয় দিক থেকেও সাওমের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু সাওম এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

অর্থ : "সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।" (বুখারি)

যেহেতু সাওয়াবের আশায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করা হয় সেহেতু আল্লাহ তায়ালা রোযাদারের পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। যেমন, মহানবি (স.) বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।" (বুখারি)

এটি একটি মৌলিক ফরজ কাজ। যদি কেউ তা অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

সাওমের সামাজিক গুরুত্ব

সাওম পালনের মাধ্যমে একজন লোক ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। সমাজের নিরন্ন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। সাওম (রোযা) পালনকারী ব্যক্তি অন্যায়-অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার করে চলে। হানাহানি থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় একে অপরকে সাহারি ও ইফতার করায় এবং অভাবীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বন্ধন আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয়। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় আমাদের সাওম পালন করা উচিত। আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাওম পালন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সাওমের সামাজিক শিক্ষার উপর একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৪

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

পরিচয়

অর্থনৈতিকভাবে ধনী ও গরিব উভয় শ্রেণির মানুষ সমাজে রয়েছে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয়সাধনে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাকাত আদায় করলে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল হয়ে উঠবে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি হবে। এতে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে। হযরত মুহাম্মদ (স.) যাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন-

اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ

অর্থ : "যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধ।" (বায়হাকি)

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। আর ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। নিসাব হলো ন্যূনতম সম্পদ, যা থাকলে যাকাত ফরজ হয়। এ ক্ষেত্রে যাকাত প্রদানে ধনীর সম্পদ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। তাই একে যাকাত বলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয় বরং এটা গরিবের অধিকার। তাই আল্লাহ যাকাত আদায় করাকে আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ : "আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর।" (সূরা আন-নূর, আয়াত ৫৬)

যাকাতের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের কথাও বলেছেন। যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়। যাকাতের সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। এসব কারণেই মহান আল্লাহ মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন।

সামাজিক গুরুত্ব

যাকাত সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মাঝে সম্পদের বৈষম্য দূর করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط

অর্থ : "যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

সুতরাং সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু করে বৈষম্য দূর করে সাম্যের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নৈতিক গুরুত্ব

যাকাত মানুষের মনে খোদাভীতি সৃষ্টি করে। পবিত্র ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। অপচয় রোধ করতে শেখায়। সর্বোপরি যাকাত মানুষের আত্মিক প্রশান্তি, নৈতিক উন্নতি, সম্পদের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

অর্থ : "আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র এবং পরিশোধিত করবেন।" (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ১০৩)

অতএব নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা যাকাত আদায় করব।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার উৎসগুলোর মধ্যে যাকাত হলো অন্যতম। এর উপর ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য নির্ভরশীল। এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত ও শক্তিশালী হয়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল লোকগুলো ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। দিনে দিনে সম্পদশালী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰتِ ،

অর্থ : "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৬)

আমরাও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের চেষ্টা করব।

ধর্মীয় গুরুত্ব

কোনো মুসলমান যাকাত না দিলে সে আর পরিপূর্ণ মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেন-

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

অর্থ : "যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালও অস্বীকারকারী।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত ৭)

যাকাত অস্বীকার করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করার শামিল। ইসলামি আইনে যাকাত দানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত

অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সালাত ও সাওম শারীরিক ইবাদত। আর যাকাত হলো আর্থিক ইবাদত। সুতরাং যাকাত আদায় করা একজন মুসলিমের ইমানি দায়িত্ব।

যাকাত অসহায় ও দরিদ্রের অধিকার

যাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য বা অধিকার। কেউ ইসলামের অনুসারী হলে তার উচিত স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন-

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ○

অর্থ :"আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।" (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৯)

তাই সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদ ভোগ করার পূর্বে চিন্তা করবে যে, এতে অসহায়দের অধিকার আছে। তাদের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। অন্যথায় সমুদয় সম্পদ তার জন্য অপবিত্র হয়ে যাবে। পরিণামে তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "আর যারা স্বর্ণ ও রূপা (সম্পদ) জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দিন।" (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ৩৪)

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে বেকার ও গরিবদের জন্য অনেক কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। এতে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। দারিদ্র্য দূরীভূত হবে এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। ধনী-দরিদ্রের মাঝে সম্পদের বৈষম্য দূর হবে। কাজেই ধনীদের শরিয়তের বিধান অনুসারে যাকাত আদায় করা একান্ত আবশ্যক।

কাজ: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্বের উপর একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৫
হজ (اَلْحَجُّ)

পরিচয়

হজ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি। 'হজ' এর আভিধানিক অর্থ হলো- সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ ঐ সমস্ত ধনী মুসলমানের উপর ফরজ যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

অর্থ : "আর মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)।

সামর্থ্যবানদের জন্য হজ জীবনে একবার পালন করা ফরজ।

হজের ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ

হজের মোট ৩টি ফরজ রয়েছে। যথা-

১. ইহরাম বাঁধা (আনুষ্ঠানিকভাবে হজের নিয়ত করা)।

২. ৯ই জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত (১০ই জিলহজ ভোর থেকে ১২ই জিলহজ পর্যন্ত যেকোনো দিন কাবা শরিফ তাওয়াফ করা)।

হজের ওয়াজিব-৬টি। যথা-

১. ৯ই জিলহজ দিবাগত রাতে মুযদালিফা নামক স্থানে অবস্থান করা।

২. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ (দৌড়ানো) করা।

৩. ১০, ১১ ও ১২ই জিলহজ পর্যায়ক্রমে মিনায় তিনটি নির্ধারিত স্থানে ৭টি করে কংকর (পাথর কণা) শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা।

৪. কুরবানি করা।

৫. মাথা কামানো বা চুল কেটে ছোট করা।

৬. বিদায়ী তাওয়াফ করা (এটি মক্কার বাইরের লোকদের জন্য ওয়াজিব)।

অপর পৃষ্ঠায় চিত্রের মাধ্যমে হজের কার্যক্রমগুলো দেখানো হলো।

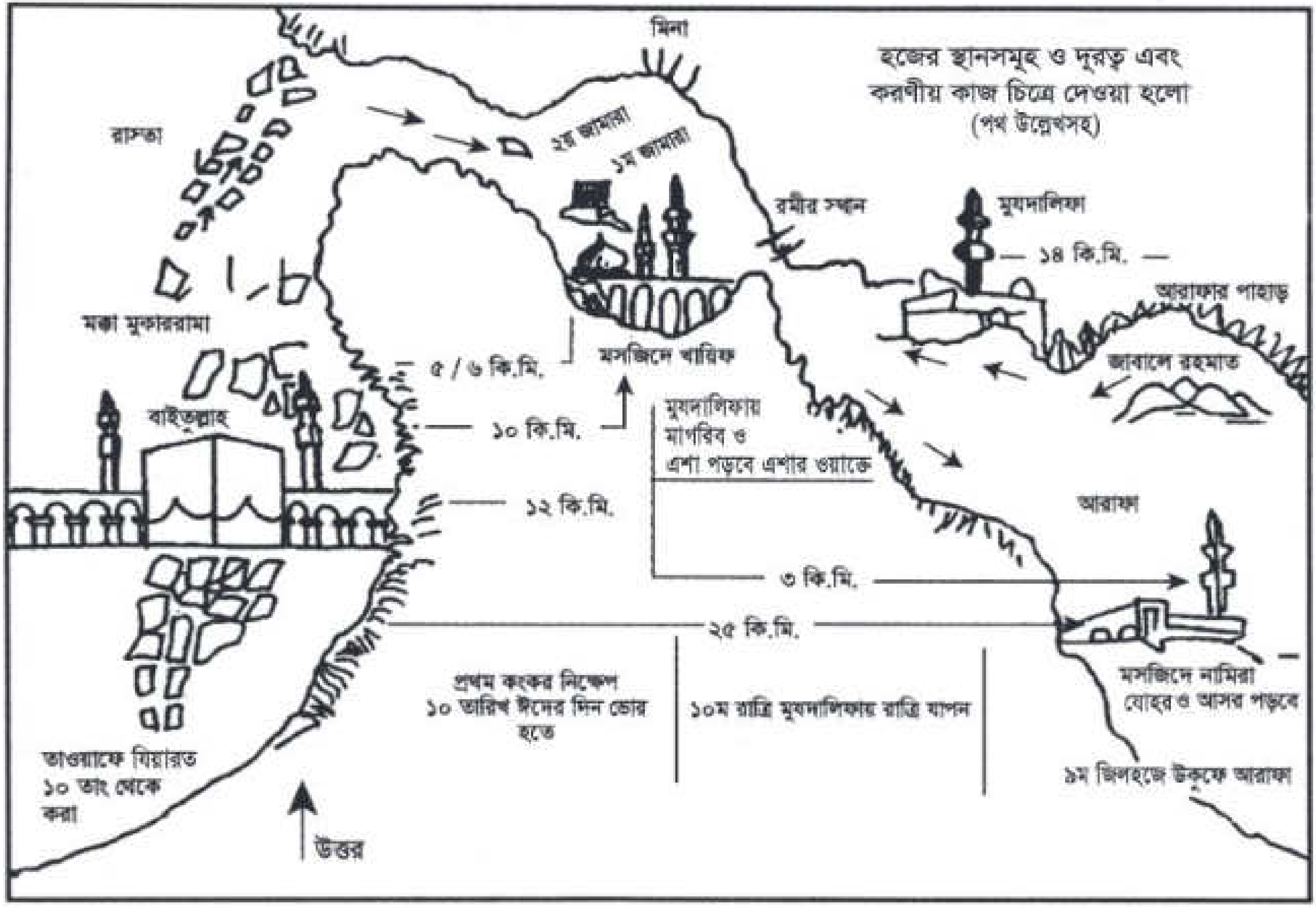

ছবি : হজের স্থানসমূহ

হজের ধর্মীয় গুরুত্ব

ইসলামে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা হাজ্জ নামে একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ হজের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ্ (স.) থেকেও হজের গুরুত্বের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেন-

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ -

অর্থ : "মাকবুল (আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়) হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই।" (বুখারি-মুসলিম)। হজের মাধ্যমে বিগত জীবনের গুনাহ্ মাফ হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।" (ইবনে মাজাহ)

হজ অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যাবে। আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হজ করার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

সামাজিক গুরুত্ব

হজের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। প্রতিবছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। হজ বিশ্বমুসলিমের মহাসম্মেলন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, "এবং মানুষের নিকট হজের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার নিকট (মক্কায়) আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে আরোহণ করে। তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ২৭)

হজে এসে সবাই একই রকম পোশাক পরিধান করে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সমর্পণ করে। সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ করে বলতে থাকে লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক : হাজির হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে হাজির।

হজের শিক্ষা ও তাৎপর্য

ধন-সম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ শেখায়। পারস্পরিক ভাব ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সৌহার্দ্যবোধ জাগ্রত করে। আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার কারণে সাধারণ মানুষ হাজিদের সম্মান করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর রহমত পেতে হলে তাঁর আদেশ পালনার্থে ধনী মুসলমানদের যতশীঘ্র সম্ভব হজ আদায় করা উচিত। আমরাও হজ থেকে শিক্ষা লাভ করে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হব।

কাজ : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে প্রতি দলের একজনকে 'হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন' এর উপর ২/৩ মিনিট বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পাঠ ৬

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এ অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ সামাজিক জীব। পৃথিবীর কোনো মানুষই একা তার সকল কাজ করতে পারে না। শিল্পায়নের এ যুগে জীবনধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই একে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এক ব্যক্তির অধীনে একাধিক ব্যক্তি কাজকর্ম করে। এতে কেউ মালিক হয় আবার কেউ হয় শ্রমিক। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মালিক শ্রেণি যেমন শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না তেমনিভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন মালিক শ্রেণির বেতন-ভাতার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের কাজ করে শ্রমের মূল্য গ্রহণ করা ঘৃণার কাজ নয়। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও শ্রমিকের কাজ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো– কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম ও পবিত্র? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির নিজ শ্রমের উপার্জন এবং সৎব্যবসালব্ধ মুনাফা। (বায়হাকি)

ইসলাম অধীনস্থ লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

অর্থ : "আর তোমরা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে ভালো আচরণ কর এবং নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, মুসাফির ও তোমাদের অধীনস্থ যেসব দাস-দাসী (শ্রমিক) রয়েছে তাদের প্রতিও সদয় হও।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩৬)

মালিক ও শ্রমিকের মাঝে এক চমৎকার দৃষ্টান্ত আমরা হযরত আনাস (রা)-এর জীবন থেকে পাই। তিনি বলেন, "আমি দশ বছর যাবৎ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমার সম্পর্কে কখনো উহ! শব্দ বলেননি এবং কখনো বলেননি, এটা করোনি কেন? এটা করেছ কেন? আমার বহুকাজ তিনি নিজ হাতে করে দিতেন।" (বুখারি)

হযরত উমর (রা) আমিরুল মুমিনিন ছিলেন। জেরুজালেম সফরে উটের পিঠে চড়া ও উট টেনে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি সাম্য ও মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উটের পিঠে চড়া ও উটের রশি টানার বিষয়ে নিজের ও ভৃত্যের মাঝে পালাক্রম ঠিক করে নিয়েছিলেন। মালিক-শ্রমিকের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

বিদায় হজের সময় রাসুল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, একজন অধীনস্থ কর্মচারীকে কতবার ক্ষমা করা যেতে পারে? হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছিলেন–

كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ

অর্থ : "দৈনিক সত্তর বার।" (তিরমিযি)

মনিবের উচিত তার শ্রমিকের শক্তি ও সামর্থ্য বিচার করে তাকে কাজ দেওয়া। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন–

وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيْقُ

অর্থ : "আর তাকে (শ্রমিককে) তার সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ দেওয়া যাবে না।" (মুসলিম)

খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ করে সকল কাজে মালিক শ্রমিকের মাঝে কোনো বৈষম্য ইসলাম অনুমোদন করে না। শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "তারা (যারা তোমাদের কাজ করে) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সে (মালিক) যা খায় তার অধীনস্থদেরও যেন তা খাওয়ায়। সে (মালিক) যা পরে তাদেরকে যেন তা পরতে দেয়। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না যা তার ক্ষমতার বাইরে। এমন কাজ (ক্ষমতার বাইরের) হলে তাকে (শ্রমিককে) যেন সাহায্য করে।" (বুখারি ও মুসলিম)

খুব দ্রুত শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন–

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

অর্থ : "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (ইবনু মাজাহ)

পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করো না।" একইভাবে শ্রমিককেও তার মালিকের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "গোলাম (শ্রমিক) যখন তার মালিকের কাজ সুচারুরূপে করে এবং সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর ইবাদত করে তখন সে দ্বিগুণ প্রতিদান পায়।" (বুখারি ও মুসলিম)

মালিক-শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে। শ্রমিক ও মালিকের মাঝে কোনো দিন মনোমালিন্য হবে না। কল- কারখানায় স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে। কাজেই দেশ ও জাতির কল্যাণে আমাদের ইসলাম প্রদত্ত আদর্শ শ্রমনীতি অনুসরণ করা উচিত।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ক্লাসে শ্রমিকের অধিকারের উপর ১০টি বাক্য তৈরি করবে।

পাঠ ৭

ইলম (জ্ঞান)

ইলম আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো- জ্ঞান, জানা, অবগত হওয়া, বিদ্যা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। অপরদিকে ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা। তাই প্রতিটি মুসলিম কার আনুগত্য করবে এবং কীভাবে করবে? কার নিকট আত্মসমর্পণ করবে? এবং কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে? তা অবশ্যই জানতে হবে। ইলম ব্যতীত তা জানা যাবে না। তাই ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) এর গুরুত্ব এত বেশি যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিলের সূচনা করেছেন পড়ুন (اِقْرَأْ) শব্দ দ্বারা। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ۔

অর্থ : "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক, আয়াত ১)। সুতরাং পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۔

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।" (সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত ১১)

ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : "ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

হযরত মুহাম্মদ (স.) অন্যত্র জ্ঞানার্জনকে উত্তম ইবাদত বলে অভিহিত করেছেন। ইলমের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে যে ধরনের ইলম অর্জন করলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা যায়, বৈধ-অবৈধ বোঝা যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায় তাই হলো উত্তম ইলম।

ইলম-এর প্রকারভেদ

ইলম দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: (ক) দীনি ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) ও (খ) দুনিয়াবি ইলম (পার্থিব জ্ঞান)।

দীনি ইলম বলতে সাধারণত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন- কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, তাফসির ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

আর দুনিয়াবি ইলম বলতে শুধু পার্থিব উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন- গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদির জ্ঞান।

অন্যভাবে ইলমকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) গ্রহণীয় জ্ঞান (খ) বর্জনীয় জ্ঞান।

গ্রহণীয় জ্ঞান হলো যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে। যেমন– নৈতিক জ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল, পদার্থ-রসায়নসহ সকল কল্যাণকর জ্ঞান। আর বর্জনীয় জ্ঞান হলো যে জ্ঞান মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না, বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়। যেমন– অনৈতিক জ্ঞান, চুরি, ডাকাতি, অন্যায়, জুলুম, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা দেশ থেকে একদলকে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের জ্ঞানে পণ্ডিত হতে হবে, অন্যথায় সকলকেই আল্লাহর নিকট পরকালে কৈফিয়ত দিতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

অর্থ: "তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১২২)

সুতরাং আমাদের মধ্যে একদল লোককে অবশ্যই দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনিভাবে পার্থিব শিক্ষা অর্জনেরও গুরুত্ব রয়েছে। তবে তা অবশ্যই আল্লাহর কোনো বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না। বরং তার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় থাকতে হবে। কারণ শিক্ষার সাথে নৈতিকতা থাকলেই কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। আর শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়।

মূলত ইসলামের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা। যেমন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন– "দ্বীন হলো কল্যাণ করা।" (মুসলিম)। তাই যেসব ইলম মানবজীবনে কল্যাণ সাধন করে তা অর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য। সুতরাং যে ইলম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন করবে তা আমরা শিখব ও শিখাব।

কাজ: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে গ্রহণীয় জ্ঞান ও বর্জনীয় জ্ঞানের উপর ৫টি করে উদাহরণ পেশ করবে।

পাঠ ৮

শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

যে নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে শিক্ষার্থী বলা হয়। একজন প্রকৃত শিক্ষার্থীর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। নিম্নে একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো–

১. শিক্ষকগণের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।
২. সাক্ষাৎ হলে বিনয়ের সাথে সালাম দিয়ে তাঁদের খোঁজ-খবর নেওয়া।
৩. শিক্ষক যা শিক্ষা দেন তা মনোযোগ সহকারে শোনা ও পালন করা।
৪. সব সময় শিক্ষকগণের সাথে নম্র, ভদ্র ও উত্তম আচরণ করা।
৫. সহপাঠীদের সাথে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
৬. নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা।
৭. শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।
৮. শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখা।
৯. শ্রেণিকক্ষে বা অন্য কোথাও শিক্ষকের সাথে দেখা হলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান করা।
১০. অনুমতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাওয়া।
১১. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উত্তম শিক্ষা মেনে চলা।
১২. শিক্ষকগণ অপছন্দ করেন এমন কাজ না করা।
১৩. কোনো অবস্থাতেই কারও সাথে অভদ্র আচরণ না করা।
১৪. সর্বাবস্থায় শিক্ষকের কল্যাণ কামনা করা ও মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দোয়া করা।
১৫. সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া।
১৬. শেখার প্রতি উৎসাহী হওয়া ও সর্বদা শিক্ষকের সাহচর্যে থাকার চেষ্টা করা।
১৭. সবকিছু বুঝেশুনে পড়া, না বুঝে পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করা।
১৮. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যা পাঠদান করবেন তা লিখে নেওয়া।
১৯. প্রতিদিনের পড়া নিয়মিতভাবে আয়ত্ত করা।
২০. পরের দিনের পড়া পূর্বের দিন দেখে ক্লাসে যাওয়া।

ইমাম শাফেয়ি (র.) ছাত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর শিক্ষক আল্লামা ওয়াকি (র.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– "ছাত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো সকল পাপকাজ বর্জন করা।"

আমরা শিক্ষার্থীর এ বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করব ও আদর্শ ছাত্র হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের উপর ৫টি প্ল্যাকার্ড বাড়ির কাজ হিসেবে তৈরি করে আনবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৯

শিক্ষকের গুণাবলি

যিনি আমাদের শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষক। পৃথিবীতে সবচাইতে সম্মান ও মর্যাদার পেশা হলো শিক্ষকতা। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেছেন-

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

অর্থ : "আমাকে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে।" (ইবনু মাজাহ)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পেশার লোকের বৈশিষ্ট্যগুলোও শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে শিক্ষকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ক. একজন ভালো শিক্ষক অবশ্যই আদর্শবান হবেন। তিনি- (১) আদর্শিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন; (২) নিজস্ব ধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য জীবন দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন; (৩) উত্তম আদর্শের ভিত্তিতে তিনি ছাত্রদের গড়ে তুলবেন; (৪) কথা ও কাজে মিল রাখবেন; (৫) আদর্শ প্রচারে কৌশলী ও সাহসী হবেন; (৬) শিক্ষকতাকে নিজের জীবনের পেশা ও ব্রত হিসেবে নেবেন; (৭) দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে এ পেশায় আত্মনিয়োগ করবেন ও (৮) অন্যায়ের ব্যাপারে আপসহীন হবেন।

খ. একজন ভালো শিক্ষক অবশ্যই গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি- (১) সবসময় জ্ঞানচর্চা করবেন; (২) ক্লাসে পড়ানোর জন্য আগেই প্রস্তুতি নেবেন; (৩) সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা রাখবেন; (৪) মেধা বিকাশে সহায়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন; (৫) বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করবেন।

গ. একজন ভালো শিক্ষক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হবেন। তিনি- (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন; (২) শালীন, মার্জিত ও ব্যক্তিত্বরক্ষাকারী পোশাক পরিধান করবেন; (৩) বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গির অধিকারী হবেন; (৪) মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখবেন; (৫) নিয়মনীতির ক্ষেত্রে কঠোর হবেন; (৬) সুস্থ মন ও দেহের অধিকারী হবেন।

ঘ. একজন ভালো শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সম্পন্ন হবেন। তিনি-

(১) স্নেহ-মমতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন।

(২) সকল শিক্ষার্থীকে সমান চোখে দেখবেন।

(৩) ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান লাভের উৎসাহ তৈরি করবেন।

(৪) প্রয়োজনে একটি বিষয় বার বার বলবেন।

(৫) ছাত্রদের একান্ত আপনজন হবেন।

(৬) শিক্ষার্থীদের অহেতুক ধমক দেবেন না অথবা শাসন করবেন না।

(৭) তাদেরকে প্রহার বা তাদের প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন করবেন না বরং দরদি মন নিয়ে তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন। প্রখ্যাত সাহাবি মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামি রাসুল (স.) সম্পর্কে বলেন, "আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক আর দেখিনি। আল্লাহর কসম তিনি আমাকে বকাবকি করেননি, মারেননি এবং গালমন্দও করেননি।" (মুসলিম)

ঙ. একজন ভালো শিক্ষক বিচক্ষণ হবেন। তিনি ছাত্রদের মনমেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

চ. একজন ভালো শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হবেন আন্তরিক ও দরদি। প্রশাসনের সাথে থাকবে তাঁর সুসম্পর্ক।

কর্মজীবনে আমরা শিক্ষকতার মহান পেশায় নিযুক্ত হলে এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করব এবং আদর্শ শিক্ষক হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে একজন ভালো শিক্ষকের গুণাবলির উপর ১০টি বাক্য লিখবে।

পাঠ ১০

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

শিক্ষক হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর। পিতা-মাতার পরই শিক্ষকের মর্যাদা। শিক্ষক পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা-মাতা সন্তানকে জন্ম দিয়ে শুধু লালন-পালন করেন। পক্ষান্তরে শিশুদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন একজন শিক্ষক।

শিক্ষার্থীরা অনুকরণপ্রিয়। কাজেই একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, শিক্ষার্থীরা তাই শিখবে। শিক্ষার্থীদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী হবে শিক্ষকরাই ছোট বেলায় তা শিখিয়ে দেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যা তারা পরিণত বয়সে কাজে লাগিয়ে সার্বিক উন্নতি লাভ করে। ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় শিক্ষকগণ যেভাবে ত্যাগের পরিচয় দেন তার জন্য শিক্ষকগণের যথাযথ সম্মান করা আমাদের কর্তব্য।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন, শিক্ষকও তেমনি তাঁর ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎ পথ দেখান। পুত্র তার পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, অন্যদিকে ছাত্রও তার শিক্ষক থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র যেমন পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পরিচর্যা করে বড় সম্পদশালী হতে পারে, শিক্ষার্থীও তেমনি শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ করে বড় জ্ঞানী হতে পারে।

নবি ও রাসুল (আ.) গণ হলেন শিক্ষক আর তাঁদের উম্মত হলো তাঁদের ছাত্র। রাসুলুল্লাহ (স.) এই উম্মতের জ্ঞানীদেরকে নবিদের উত্তরাধিকারী বলেছেন। তিনি বলেন, "আলেমগণ (জ্ঞানীরা) হলেন নবিদের উত্তরাধিকারী। তাঁরা সম্পদ ও মালের উত্তরাধিকারী নন, বরং তাঁরা হলেন জ্ঞানের উত্তরাধিকারী।" (তিরমিযি)

সুতরাং পুত্র ও পিতার মাঝে যেমন উত্তরাধিকারের সম্পর্ক আছে; ছাত্র-শিক্ষকের মাঝেও তেমন সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই আমরা এই সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) বলেছেন, "যার কাছে আমি একটি শব্দও শিখেছি আমি তার দাস। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রি করতে পারেন কিংবা আযাদ করে দিতে পারেন কিংবা ইচ্ছা করলে দাস বানিয়েও রাখতে পারেন।" তাই তাঁর মতে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো ভৃত্য-মুনিব সম্পর্ক। এক বিনম্র শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। বস্তুত ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হবে সুন্দর, যেখানে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালোবাসা বিরাজ করবে।

কাজ : শিক্ষকের সাথে ছাত্রের আচরণ কেমন হওয়া উচিত- শিক্ষার্থীরা এর উপর একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১১

শিক্ষা ও নৈতিকতা

শিক্ষা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাহীন জাতি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো। সঞ্চিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে নিজের জীবনে সফলভাবে প্রয়োগ করাকেই শিক্ষা বলে। এই শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে এবং মানব হৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশসাধন। এখানে শিক্ষা বলতে বিশেষভাবে ইসলামি শিক্ষাকেই বোঝানো হয়েছে। আর যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরা হয়েছে তাকে ইসলামি শিক্ষা বলে। এককথায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে সমন্বিত শিক্ষাই হলো ইসলামি শিক্ষা। এ শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সৎ, চরিত্রবান, খোদাভীরু, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে।

ইসলাম শিক্ষার মূল উৎস হলো দু'টি–

১. আল-কুরআন : এই কুরআনে মানবজাতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুই মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : "কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি।" (সূরা : আল-আনআম, আয়াত ৩৮)

অন্যত্র আল্লাহ আরও বলেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : "আর আমি সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে আপনার উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৮৯)

২. আল হাদিস : রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতি হলো হাদিস। এটি ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় উৎস। হাদিসের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ : "আর রাসুল (স.) তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

কুরআন ও হাদিস ব্যতীত ইসলাম ধর্মবিশারদদের ঐকমত্য (ইজমা) এবং তাঁদের সাদৃশ্যমূলক অভিমত (কিয়াস) ইসলামি শিক্ষার যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ উৎস।

একজন মুসলমানের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো ইসলামি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মূলত ইসলামি শিক্ষার ভিত্তি : তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি ও রাসুলগণ (আ.)-এর কার্যক্রম ও দাওয়াত) ও আখিরাত (মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি) এ তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এগুলোর আলোকে জীবন গড়ব এবং জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করব।

নৈতিকতা

সততা, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টি কথা ও উন্নত চরিত্র- এ সবকিছুর সমন্বয় হলো নৈতিকতা। একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাল-চলন, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন সবকিছুই যখন প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয় তখন তাকে নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে। এই নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ (স.) সর্বোত্তম লোক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।" (বুখারি ও মুসলিম)

নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করলে তার জীবন সুন্দর ও উন্নত হয়। এর মাধ্যমে সে অর্জন করে সম্মান ও মর্যাদা। ইসলামি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। নীতিহীন ও চরিত্রহীন মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, "তাদের হৃদয় আছে উপলব্ধি করে না, চোখ আছে দেখে না; কান আছে শুনে না; এরা হলো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট। আর এরাই হলো গাফিল।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৭৯)

আমরা নৈতিকগুণে সমৃদ্ধ হব এবং তা চর্চা করে উত্তম মানুষ হব।

নৈতিকতার গুরুত্ব

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষকে ইমান ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহানবি (স.) প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমি মহান নৈতিক গুণাবলিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।" (বুখারি)

নৈতিকতার কথা শুধু মুখে বললে চলবে না। বরং বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শসমূহ জীবনে বাস্তবায়ন করে নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নীতিবান লোককে পরিপূর্ণ মুমিন হিসেবে অভিহিত করে বলেন-

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا-

অর্থ : "চরিত্রের বিচারে যে লোকটি উত্তম মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী।" (তিরমিযি)

মানুষের নৈতিকতা যত উন্নত হবে, সে তত উত্তম মানুষে পরিণত হবে। এভাবে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (স.)-এর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই লোকটিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যার আখলাক (নৈতিকতা) সবচাইতে সুন্দর।" (বুখারি)। এমনিভাবে জনৈক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর নিকট জানতে চাইলেন মহান আল্লাহ মানুষকে অনেক কিছু দান করেছেন; এর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান দান কোনটি? নবি করিম (স.) বললেন, "সবচেয়ে মূল্যবান দান সুন্দর চরিত্র।"

আমাদের উচিত সুন্দর চরিত্র ও নৈতিক আচরণ অর্জন করে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর প্রিয়পাত্র হওয়া। ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা সম্পর্কে জানা ও তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা অধিকতর সহজ। ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ নৈতিকতা লাভ করতে পারে। তাই বলা যায় যে নৈতিক শিক্ষা ইসলামি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও নৈতিকতা বিষয়ে ১০টি বাক্য বাড়ির কাজ হিসেবে তৈরি করে আনবে এবং শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১২

জিহাদ (اَلْجِهَادُ)

পরিচিতি

জিহাদ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায়, জান-মাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দীনকে (ইসলামকে) সমুন্নত করাই হলো জিহাদ। অনেকেই জিহাদ বলতে শুধু রক্তপাত ও কতল (হত্যা) বোঝেন। এটা সঠিক নয়। কেননা জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। পৃথিবীর যা কিছু উত্তম তাতেই আল্লাহর

সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধু জিহাদ হতে পারে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط

অর্থ : "আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৭৮)

বস্তুত সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের চেষ্টা, শ্রম ও সাধনাই হলো জিহাদ।

জিহাদের প্রকারভেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকার-

(১) স্বীয় নফসের (প্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করা। যেমন হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ

অর্থ : "প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর অনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

এরূপ জিহাদকে রাসুলুল্লাহ (স.) সবচাইতে বড় জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলেছেন–

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

অর্থ : "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের (কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ) দিকে ফিরে এসেছি।" (কানযুল উম্মাল)

(২) জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ করা। এরূপ জিহাদকে পবিত্র কুরআনে জিহাদে কাবির (বড়) বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○

অর্থ : "সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের (জ্ঞানের) সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল জিহাদ চালিয়ে যান।" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৫২)

(৩) ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এটি হলো জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

জিহাদের গুরুত্ব

জিহাদ ইসলামের একটি আমল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীনের বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষা করা এবং ইসলামের বিধিবিধান ও অনুশাসন মেনে চলা যেমন একজন মুমিনের দায়িত্ব, অনুরূপভাবে দীন রক্ষা করা, দীনকে সমুন্নত রাখা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জিহাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তেমনিভাবে তার কর্তব্য। মূলত শান্তির জন্য জিহাদ। বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য।

জিহাদের ফজিলত বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

অর্থ : "আল্লাহর পথে যে বান্দার দু'পায়ে ধূলি লাগে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।" (বুখারি)

কাজ : 'জিহাদ অর্থ সন্ত্রাস নয়' শিক্ষার্থীরা এ পাঠের আলোকে শ্রেণিতে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

জিহাদ (اَلْجِهَادُ) সম্পর্কে পূর্বের পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এ পাঠে সন্ত্রাসবাদ (اَلْإِرْهَابُ) সম্পর্কে বর্ণনা করব।

সন্ত্রাসবাদ বলতে আমরা বুঝি পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ও তাদের ক্ষতি করা।

ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে। বস্তুত উভয়ের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। বলা যায়, এ দুটো পরস্পর বিপরীত। রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদের লোভ, খুন-খারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য।

মানুষকে সত্যনিষ্ঠ ও নৈতিকগুণে গুণান্বিত করাও জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ،

অর্থ : "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সুরা আল- আনফাল, আয়াত ৩৯)

পক্ষান্তরে, সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদ অর্জন করা এবং লুটতরাজ ও খুন-খারাবির মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তপাত করতে শিখায়নি। বরং ইসলাম যে জিহাদের কথা বলে তাতে রক্তপাত নয়, মানবতার দিকনির্দেশনা দেয়। মুসলমানদের কোনো জিহাদেই নিরপরাধ সাধারণ লোকজনের কোনো ক্ষতি হয়নি। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় একশত-এর কাছাকাছি

জিহাদে (যুদ্ধে) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সবগুলো জিহাদ মিলিয়ে উভয়পক্ষে পাঁচশত এর কম লোকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

বর্তমান যুগে জিহাদের নামে যেভাবে বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, খুন-খারাবি ও নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটা সন্ত্রাসেরই নামান্তর। বস্তুত জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়।

উপরোক্ত আলোচনা ও বাস্তব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, জিহাদে সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই। জিহাদের সাথে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ইতিহাস জেনে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করব এবং প্রকৃত মুসলমান হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য আলোচনা করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামের কোন মূল স্তম্ভের বর্ণনায় একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে?

ক. সালাত খ. যাকাত

গ. সাওম ঘ. হজ।

২. 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের হাতেই পুঞ্জীভূত না হয়।'- অত্র আয়াত কোন বিষয়টি নির্দেশ করে?

ক. হজ করা খ. দান করা

গ. যাকাত আদায় ঘ. সাহায্য করা।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

বেলাল সাহেব বাংলাদেশ থেকে পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হজের সকল বিধি-বিধান সুষ্ঠুভাবে পালন করলেও অসুস্থতার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারেননি।

৩. বেলাল সাহেব হজের কোন বিধানটি পালনে অপারগ হয়েছেন ?

ক. মুস্তাহাব খ. সুন্নত

গ. ওয়াজিব ঘ. ফরজ।

৪. এমতাবস্থায় বেলাল সাহেবের করণীয় কী ?

ক. পুনরায় হজ করা খ. দম প্রদান করা

গ. সামর্থ্য থাকলে পুনরায় হজ করা ঘ. আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব শফিকুর রহমান একজন রিকশাচালক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলেন। কেউ অসুস্থ হলে তার রিকশায় হাসপাতালে নিয়ে যান। একদা রিকশাচালক জনাব শফিকুর রহমান জনৈক যাত্রীর ব্যাগসহ রেখে যাওয়া পাঁচ লক্ষ টাকা স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা দেন। প্রধান শিক্ষক সাহেব টাকার মালিকের ব্যাগে সংরক্ষিত ঠিকানার মাধ্যমে টাকাসহ ব্যাগ মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দেন।

ক. হজের ওয়াজিব কয়টি?

খ. ইসলাম শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রধান শিক্ষক সাহেবের কাজের মাধ্যমে কোন ধরনের ইবাদত পালন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব শফিকুর রহমানের কর্মকাণ্ডগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। সাজ্জাদ ও সাকিব সাহেব দুই বন্ধু। সাজ্জাদ সাহেব একটি পোশাক শিল্পের মালিক। গত রমযানের ঈদে শ্রমিকদের বোনাস দিতে গড়িমসি করায় কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য পেতে একদিন কর্মবিরতি পালন করেন। আর সাকিব সাহেব মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে হাসপাতালে কর্মরত আছেন। তিনি হাসপাতালে নিয়মিত উপস্থিত থেকে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেন। একদিন তাঁর স্কুলজীবনের শিক্ষক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে এলে তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান এবং চিকিৎসার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহনসহ যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

(ক) কে আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর?

(খ) শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও - হাদিসটি বুঝিয়ে লেখ।

(গ) সাজ্জাদ সাহেবের আচরণে কার আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) সাকিব সাহেবের কাজটি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট পাঠের আলোকে মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (اَلْاَخْلَاقُ)

আখলাক আরবি শব্দ। এটি বহুবচন। এর একবচন খুলুকুন (خُلُقٌ)। এর আভিধানিক অর্থ- স্বভাব, চরিত্র ইত্যাদি। শব্দগত বিবেচনায় আখলাক বলতে সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র উভয়কেই বোঝায়। তবে প্রচলিত অর্থে আখলাক শুধু সচ্চরিত্রকেই বুঝায়। যেমন ভালো চরিত্রের মানুষকে আমরা চরিত্রবান বলি। আর মন্দ চরিত্রের মানুষকে বলি চরিত্রহীন। ব্যবহারিক বিবেচনায় আখলাক দ্বারা ভালো ও উত্তম চরিত্রকে বোঝানো হয়।

মূলত আখলাক হলো মানুষের স্বভাবসমূহের সমন্বিত রূপ। মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতা, কর্মপন্থা সবকিছুকে একত্রে চরিত্র বা আখলাক বলা হয়। তা ভালো কিংবা মন্দ হতে পারে। এককথায়, মানুষের সকল কাজ ও নীতির সমষ্টিকেই আখলাক বলা হয়।

আখলাক দু'প্রকার। যথা-

ক. আখলাকে হামিদাহ (اَخْلَاقٌ حَمِيْدَةٌ)

খ. আখলাকে যামিমাহ (اَخْلَاقٌ ذَمِيْمَةٌ)

আখলাকে হামিদাহ হলো মানুষের প্রশংসনীয় গুণাবলি আর আখলাকে যামিমাহ মানব স্বভাবের মন্দ অভ্যাসগুলোর সামষ্টিক নাম। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে এ দু'প্রকার আখলাকের পরিচয়, গুরুত্ব, কুফল এবং কতিপয় ভালো ও মন্দ চরিত্র সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আখলাকের ধারণা, প্রকার ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- কতিপয় সদাচরণ (আখলাকে হামিদাহ) এর পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- তাকওয়ার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ওয়াদা পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সত্যবাদিতার ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- শালীনতার ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- আমানতদারির পরিচয়, আমানত রক্ষার উপায় ও আমানতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইসলামে মানবসেবার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা ও সুফল বর্ণনা করতে পারব;
- ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- ইসলামে পরিচ্ছন্নতার ধারণা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মিতব্যয়িতার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;

- আত্মশুদ্ধির ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কতিপয় অসদাচরণ (আখলাকে যামিমাহ) এর পরিচয় ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- প্রতারণার ধারণা ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গিবত ও পরনিন্দার ধারণা ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হিংসা-বিদ্বেষের ধারণা ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- ফিতনা-ফাসাদের পরিচয় ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কর্মবিমুখতা ও অলসতার কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- সুদ ও ঘুষের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজ জীবনে অসদাচরণ পরিহার ও সদাচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব ।

পাঠ ১

আখলাকে হামিদাহ

পরিচয়

আখলাক অর্থ চরিত্র, স্বভাব। আর হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয়। সুতরাং আখলাকে হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র, সচ্চরিত্র। ইসলামি পরিভাষায়, যেসব স্বভাব বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স.)-এর নিকট প্রিয় সেসব স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়।

এককথায়, মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়। মানুষের সার্বিক আচার-আচরণ যখন শরিয়ত অনুসারে সুন্দর, সুষ্ঠু ও কল্যাণকর হয় তখন সে স্বভাব-চরিত্রকে বলা হয় আখলাকে হামিদাহ।

আখলাকে হামিদাহকে আখলাকে হাসানাহ বা হুসনুল খুলুকও বলা হয়। আখলাকে হাসানাহ অর্থ সুন্দর চরিত্র। মানব চরিত্রের উত্তম ও নৈতিক গুণাবলি আখলাকে হামিদাহ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- সততা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, মানব সেবা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি।

গুরুত্ব

আখলাকে হামিদাহ মানবীয় মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর দ্বারাই মানুষ পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হয়। মানবিকতা ও নৈতিকতার আদর্শ আখলাকে হামিদাহর মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানুষের ইহ ও পরকালীন সুখ, শান্তি উত্তম আখলাকের উপরই নির্ভরশীল। সৎচরিত্রবান ব্যক্তি যেমন সমাজের চোখে ভালো তেমনি মহান আল্লাহর নিকটও প্রিয়। মহানবি (স.)-এর হাদিসে বলা হয়েছে-

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অর্থ : "আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই লোকই অধিক প্রিয়, চরিত্রের বিচারে যে উত্তম।" (ইবনে হিব্বান)

এ জন্য মানুষকে আখলাক শিক্ষা দেওয়াও নবি-রাসুলগণের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সব ধরনের সৎগুণ তাঁর চরিত্রে পাওয়া যায়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন-

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

অর্থ : "আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সুরা আল-কালাম, আয়াত ৪)

রাসুলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ -

অর্থ : "উত্তম চারিত্রিক গুণাবলিকে পূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (বায়হাকি)

রাসুলুল্লাহ (স.) নিজে যেমন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তেমনি মানবজাতিকে সচ্চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার জন্য তিনি সৎ ও নৈতিক স্বভাব অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "মুমিনগণের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের বিচারে সবচেয়ে উত্তম।" (তিরমিযি)

প্রকৃতপক্ষে সচ্চরিত্র পরকালীন জীবনেও মানুষের কল্যাণের হাতিয়ার, মুক্তির উপায় হবে। উত্তম আচার-আচরণ মানুষকে পুণ্য বা সাওয়াব দান করে। মহানবি (স.) বলেছেন, اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ

অর্থ : "সুন্দর চরিত্রই পুণ্য।" (মুসলিম)

প্রশংসনীয় আচরণ ও স্বভাব কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লা ভারী করবে। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) মিযানে সুন্দর চরিত্র অপেক্ষা ভারী বস্তু আর কিছুই থাকবে না।" (তিরমিযি)

দুনিয়ার জীবনেও আখলাকে হামিদাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে সমাজের সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায় এবং তাঁর বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে।

চরিত্রের কারণে তিনি সমাজে মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহানবি (স.) এ সম্পর্কে বলেছেন,

خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا -

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ সকল ব্যক্তি, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্র বিচারে সুন্দরতম।" (বুখারি)

সমাজের সকলে চরিত্রবান হলে সেখানে কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি থাকে না। সমাজ সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে।

সচ্চরিত্র আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। দুনিয়ায় আগত সকল নবি-রাসুলই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়াও পৃথিবীর স্মরণীয় ও বরণীয় মনীষীগণও উত্তম নৈতিক আদর্শ অনুশীলন করতেন। সচ্চরিত্রের মাধ্যমেই ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এজন্য ইসলামে আখলাকে হামিদাহ অর্জনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

> শিক্ষা : শিক্ষার্থীরা আখলাকে হামিদাহর পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজে খাতায় লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২

তাকওয়া

পরিচয়

তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। ব্যবহারিক অর্থে পরহেজগারি, খোদাভীতি, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বোঝায়। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। অন্যকথায় সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলা হয়। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাঁকে বলা হয় মুত্তাকি।

মহান আল্লাহকে ভয় করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। তিনি আমাদের সবকিছু দেখেন, জানেন। তিনি শাস্তিদাতা ও মহাপরাক্রমশালী। হাশরের দিনে তিনি আমাদের সকল কাজের হিসাব নেবেন। অতঃপর পাপকাজের জন্য শাস্তি দেবেন। আল্লাহ-ভীতি হলো আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহি করার ভয়। অতঃপর এরূপ অনুভূতি মনে ধারণ করে সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হয়। সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অশ্লীল কথা-কাজ ও চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকতে হয়। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করলে এসব পাপ থেকে সহজেই বেঁচে থাকা যায়। ফলে মুত্তাকিগণ পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করবে ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকবে, তার স্থান হবে জান্নাত।" (সুরা আন-নাযিআত, আয়াত ৪০-৪১)

গুরুত্ব

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনকেই সম্মান-মর্যাদা ও সফলতা দান করে। ইসলামি জীবন দর্শনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন মুত্তাকিগণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।" (সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

২০২৫

আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাকওয়ার মূল্য অত্যধিক। ধন-সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা, গাড়ি-বাড়ি থাকলেই মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বরং যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করতে পারেন সেই আল্লাহ্ তায়ালার নিকট বেশি মর্যাদাবান। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।" (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ৪)

পার্থিব জীবনে মুত্তাকিগণ আল্লাহ্ তায়ালার বহু নিয়ামত লাভ করে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকওয়াবানদের সর্বদা সাহায্য করেন। বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন ও বরকতময় রিযিক দান করেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ্ তার পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন।" (সূরা আত্-তালাক, আয়াত ২-৩)

পরকালেও তাকওয়াবানদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আল্লাহ্ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মুত্তাকিদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মহাসফলতা দান করবেন। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (আল্লাহকে ভয় কর) তবে আল্লাহ্ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।" (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ২৯)

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুত্তাকিগণের জন্য রয়েছে সফলতা।" (সূরা আন্-নাবা, আয়াত ৩১)

প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া মানব চরিত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব। এর মাধ্যমে মানুষ সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা লাভ করে।

নৈতিক জীবনে তাকওয়ার প্রভাব

নৈতিক জীবন গঠনে ও নীতি-নৈতিকতা রক্ষায় তাকওয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাকওয়া সকল সৎগুণের মূল। ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া। তাকওয়া মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে উদ্বুদ্ধ করে; হারাম বর্জন করতে এবং হালাল গ্রহণ করতে প্রেরণা যোগায়। মুত্তাকি ব্যক্তি সদাসর্বদা আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন, এ বিশ্বাস পোষণ করেন। ফলে তিনি কোনোরূপ অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করতে পারেন না। কোনোরূপ অশ্লীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনা করতে পারেন না। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পাপ যত গোপনেই করা হোক না কেন, আল্লাহ্ তায়ালা তা দেখেন ও জানেন। কোনোভাবেই আল্লাহ্ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাকওয়াবান ব্যক্তি সকল কাজেই নীতি-নৈতিকতা অবলম্বন করেন এবং অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা পরিহার করেন।

তাকওয়া মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে। সকল সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। ফলে মুত্তাকিগণ সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হন। অন্যদিকে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল হতে পারে না। সে নানা অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত থাকে। নৈতিক ও মানবিক আদর্শের পরোয়া করে না। ফলে তার দ্বারা সমাজে অনৈতিকতা ও অপরাধের প্রসার ঘটে।

বস্তুত তাকওয়া হলো মহৎ চারিত্রিক গুণ। নৈতিক চরিত্র গঠনে এর কোনো বিকল্প নেই। আমরা সকলেই তাকওয়াবান হওয়ার চেষ্টা করব।

> **কাজ :** তাকওয়ার পরিচয়, গুরুত্ব ও নৈতিক জীবনে তাকওয়ার প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান অর্জন করল তা শ্রেণিতে দাঁড়িয়ে শিক্ষককে শোনাবে।

পাঠ ৩
ওয়াদা পালন

পরিচয়

ওয়াদাকে আরবি ভাষায় বলা হয় আল-আহ্‌দু (اَلْعَهْدُ)। আল-আহ্‌দু এর শাব্দিক অর্থ- ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে।

গুরুত্ব

ওয়াদা পালন আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে তাকে সবাই ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে। ইসলামি জীবন দর্শনে ওয়াদা পালন করা আবশ্যক। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ

অর্থ : "হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ১)

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۝

অর্থ : "আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৩৪)

প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পালন করা অত্যাবশ্যক। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে।

ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন,

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ -

অর্থ : "যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দীন নেই।" (মুসনাদে আহমাদ)

আমাদের প্রিয়নবি (স.) সর্বদাই ওয়াদা পালন করেছেন। সাহাবি ও আউলিয়া কেরামের জীবনী পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা জীবনে কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। কেননা ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের নিদর্শন। মুনাফিকরা ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করে না। আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের এরূপ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মুমিন-মুসলমানের নিদর্শন হলো তারা ওয়াদা পালন করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা যা পালন করো না এমন কথা কেন বলো?" (সূরা আস- সাফ্ফ, আয়াত ২)

সুতরাং কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করলে বা চুক্তি সম্পাদন করলে তা পূর্ণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি-সফলতা লাভ করা যাবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ওয়াদা পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

সত্যবাদিতা

পরিচয়

সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদ্ক। সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। অন্যকথায়, বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সিদ্ক বলা হয়। অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ব্যতিরেকে হুবহু বা অবিকল বর্ণনা করাই হলো সিদ্ক। যে ব্যক্তি সত্যবাদী তাকে বলা হয় সাদিক (صَادِقٌ)। আর মহাসত্যবাদীকে সিদ্দিক (صِدِّيْقٌ) বলে।

সত্যবাদিতার বিপরীত হলো মিথ্যাচার। কোনো ঘটনা বা বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হলো মিথ্যাচার। মিথ্যাচারকে আরবিতে আল কাযিব (اَلْكِذْبُ) বলে। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তাকে বলা হয় কাযিব (اَلْكَاذِبُ) আর চরম মিথ্যাবাদী হলো কায্যাব (اَلْكَذَّابُ)।

গুরুত্ব

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে সত্যবাদিতা ও সততা অবলম্বন করলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। সদা সর্বদা সত্য, সুন্দর ও সঠিক কথা বলা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। তিনি বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ○

অর্থ : "হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও সঠিক কথা বলো।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৭০)

মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী মুমিনগণের একটি অন্যতম নিদর্শন হলো তাঁরা সত্যবাদী। জীবনের সর্বাবস্থায় তাঁরা সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করেন। শুধু নিজে নিজে সত্য বলার চর্চা করলেই হবে না বরং সত্যবাদীদের সাথে সুসম্পর্ক থাকতে হবে। এতে সমাজে সার্বিকভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সত্যবাদীদের সাথি হও।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১১৯)

প্রকৃত মুমিন অবশ্যই সত্যবাদী হবেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করেছেন। তাঁর সাথি হযরত আবু বকর (রা.) ও ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। তাই হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলা হয় সিদ্দিক।

যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী তাকে কেউ ভালোবাসে না, সম্মান করে না। বরং সকলেই তাকে ঘৃণা করে। কেননা মিথ্যা বলা মহাপাপ। এটি সকল পাপের মূল। মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ তায়ালা চরম অসন্তুষ্ট।

প্রভাব ও পরিণতি

মানবজীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব সীমাহীন। সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রক্ষা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না। একটি হাদিসে আমরা এর প্রমাণ পাই। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদা জনৈক ব্যক্তি মহানবি (স.)-এর নিকট এসে বলল, 'আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি এবং আরও অনেক খারাপ কাজ করি। সবগুলো খারাপ কাজ একসঙ্গে ত্যাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে যেকোনো একটি খারাপ কাজ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিন।' মহানবি (স.) বললেন, "তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।" লোকটি বলল, এ তো খুব সহজ কাজ। মহানবি (স.)-এর কথামতো লোকটি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল। পরে দেখা গেল যে, মিথ্যা বলা ত্যাগ করায় তার পক্ষে আর কোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব হলো না। সে সবগুলো খারাপ কাজ ছেড়ে দিল। কেননা সে ভাবল, কেউ তাকে অপরাধের কথা জিজ্ঞেস করলে সে মিথ্যা বলতে পারবে না। বরং স্বীকার করতে হবে। এতে সে লজ্জিত হবে ও শাস্তি ভোগ করবে। এভাবে শুধু মিথ্যা ত্যাগ করায় লোকটি সকল খারাপ কাজ থেকে মুক্তি পেল। সত্যবাদিতা এভাবেই মানুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে।

সত্যবাদিতার পরিণতি হলো সফলতা ও মুক্তি। যেমন বলা হয়,

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ-

অর্থ : "সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।"

সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে। আর আখিরাতে সত্যবাদিতার প্রতিদান হলো জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ

অর্থ : "এ তো সেই দিন, যে দিন সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দান করবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ১১৯)

মহানবি (স.) বলেন, "তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।" (বুখারি ও মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে আছে, একবার মহানবি (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী আমল করলে জান্নাতবাসী হওয়া যায়? তিনি উত্তরে বললেন, "সত্য কথা বলা।" (মুসনাদে আহমাদ)

সত্যবাদিতা নৈতিক গুণাবলির অন্যতম প্রধান গুণ। এটি মানুষকে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা দান করে। সুতরাং আমাদের সকলেরই সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হওয়া একান্ত কর্তব্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সত্যবাদিতার উপর ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫

শালীনতা

শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়। গর্ব-অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও অশ্লীলতা ত্যাগ করে জীবনাচরণের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি নীতি-আদর্শের অনুসারী হওয়ার দ্বারা শালীনতা অর্জন করা যায়।

শালীনতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি বহু নৈতিক গুণের সমষ্টি। ভদ্রতা, নম্রতা, সৌন্দর্য, সুরুচি, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বিত রূপের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়। অশ্লীলতা হলো শালীনতার বিপরীত। গর্ব-অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, কুরুচি ও কুসংস্কার শালীনতাবিরোধী অভ্যাস। এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই শালীনতা অর্জনের উপায়।

শালীনতার গুরুত্ব

ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম। এটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুরুচিপূর্ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। মার্জিত, নম্র, ভদ্র ও পূত-পবিত্র হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলা ইসলামি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এ লক্ষ্যে শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। বলা যায় শালীনতাই হলো ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

ইসলাম সকল মানুষকেই নম্র, ভদ্র ও শালীন হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। যেসব কাজ শালীনতাবিরোধী, ইসলামে সেসব কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা অশ্লীল ও অশালীন কাজকর্ম মানুষের মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের অভ্যাস গ্রহণ করে। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ভেঙে দেয়। যার কারণে সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়। যৌন হয়রানি, ব্যভিচার ইত্যাদির জন্ম হয়। এজন্য ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা রক্ষা ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আর তোমরা (নারীরা) নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহিলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৩)

অতএব, বিনা প্রয়োজনে অশালীনভাবে নারীদের বাইরে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। বরং প্রয়োজনে বাইরে গেলে পর্দা ও শালীনতা অবলম্বন করে যেতে হবে। পুরুষদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাদেরকেও অবশ্যই শালীনভাবে সমাজে বিচরণ করতে হবে।

পূত-পবিত্রতা ও শালীনতার অন্যতম বিষয় হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। লজ্জাশীলতার ফলে মানুষ পরকালীন সফলতা লাভ করবে। মহানবি (স.) বলেন, اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

অর্থ : "লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়।" (মুসলিম)

মহানবি (স.) আরও বলেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ অর্থ : "লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা।" (সুনানে নাসাই)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, "অশ্লীলতা যেকোনো জিনিসকে খারাপ করে এবং লজ্জাশীলতা যেকোনো জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।" (তিরমিযি)

সুতরাং চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার-আচরণে লজ্জাশীল হওয়া প্রয়োজন। সর্বাবস্থায় রুচিসম্মত, ভদ্র, সুন্দর ও মার্জিত গুণাবলির অনুসরণ করার দ্বারা শালীনতা চর্চা করা যায়। শালীনতার ফলে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, আমরা সকল কাজে শালীনতা রক্ষা করব। অশ্লীল ও অশালীন কাজ ত্যাগ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শালীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

আমানত

পরিচয়

আমানত আরবি শব্দ। এর অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। তবে ব্যাপকার্থে শুধু ধন-সম্পদ নয় বরং যেকোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। একজনের জান, মাল, সম্মান, কথা-প্রতিজ্ঞা সবকিছুই অন্যের নিকট আমানত স্বরূপ। যিনি গচ্ছিত সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন এবং তা প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেন তাকে বলা হয় আমিন বা আমানতদার।

আমানতের বিপরীত হলো খিয়ানত। খিয়ানত অর্থ আত্মসাৎ করা, ক্ষতিসাধন করা, ভঙ্গ করা। আমানতকৃত দ্রব্য বা বিষয় যথাযথভাবে প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে না দিয়ে আত্মসাৎ করাকে খিয়ানত বলে। যে ব্যক্তি গচ্ছিত জিনিসের খিয়ানত করে তাকে খায়িন (اَلْخَائِنُ) বলা হয়।

আমানত রক্ষার গুরুত্ব

আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সচ্চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকে। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮)

আমানত রক্ষা করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আমানতের খিয়ানত করে না। মহানবি (স.) বলেছেন, لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ

অর্থ: "যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।" (মুসনাদে আহমাদ)

আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গ স্বরূপ। আমানতের খিয়ানত করা ইমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটি মুনাফিকের চিহ্ন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন আমানতদারির মূর্ত প্রতীক। ঘোর শত্রুরাও তাঁকে আমানতদার হিসেবে জানত, তাঁর নিকট তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ আমানত রাখত। তাঁকে তারা আল আমিন বা বিশ্বাসী তথা আমানতদার নামে ডাকত। রাসুলুল্লাহ (স.)ও সারাজীবন আমানত রক্ষা করে চলেছেন। এমনকি হিজরতের সময় মক্কার কাফিররা যখন তাকে হত্যা করতে বের হয়, তখনও তিনি আমানতের কথা ভোলেননি। তিনি তাদের গচ্ছিত সম্পদ প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইসলামি জীবন দর্শনে আমানত রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমানতের খিয়ানত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, হারাম। মহানবি (স.)-এর হাদিসে এসেছে খিয়ানত করা মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ ০

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।" (সুরা আল-আনফাল, আয়াত ৫৮)

খিয়ানত মানুষের পার্থিব জীবনেও বিপর্যয় ডেকে আনে। মহানবি (স.) বলেছেন, "আমানতদারি সচ্ছলতা ও খিয়ানত দারিদ্র্য ডেকে আনে।" (মুসনাদে শিহাব আল-কাযায়ি)

খিয়ানতকারী মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। লোকেরা তাকে ঘৃণা করে। এড়িয়ে চলে। তার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন করতে আগ্রহী হয় না। ফলে খিয়ানতকারী আর্থিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমানতের ক্ষেত্র

কারও নিকট কোনো দ্রব্য বা জিনিস গচ্ছিত রাখা হলে তা অবশ্যই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। গচ্ছিত দ্রব্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। তা নিজ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং প্রকৃত মালিক যখন চাইবে তখনই তা ফিরিয়ে দিতে হবে। এটাই আমানতের ইসলামি নীতি ও পদ্ধতি।

আমানতের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। শুধু ধনসম্পদই আমানত নয়, বরং কথা, কাজ, মান-সম্মানও আমানত হতে পারে। মহানবি (স.) বলেছেন, "যখন কোনো লোক কথা বলে প্রস্থান করে, তখন সে কথাও এক প্রকার আমানত স্বরূপ।" (আবু দাউদ)

অর্থাৎ কেউ বিশ্বাস করে কোনো কথা বললে এবং তা গোপন রাখতে বললে সে কথাও আমানত স্বরূপ। সে কথা অন্যের নিকট বলে ফেললে আমানতের খিয়ানত করা হয়।

বস্তুত ইসলামে মানুষের প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্যই আমানত স্বরূপ। ব্যক্তিগত কাজের পাশাপাশি মানুষকে আরও বহু দায়িত্ব পালন করতে হয়। মানুষের এসব পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমানত হিসেবে গণ্য। নিম্নে আমানতের কতিপয় ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো-

১. মাতাপিতার নিকট সন্তান আমানত স্বরূপ। সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা, তাদের সুশিক্ষা দিয়ে বড় করে তোলা তাদের দায়িত্ব।

২. সন্তানের নিকট মাতাপিতা আমানত। মাতাপিতার আনুগত্য করা, তাঁদের সেবা করা সন্তানের কর্তব্য ও আমানত।

৩. শিক্ষকের নিকট ছাত্র-ছাত্রী আমানত। তাদের সুশিক্ষা দেওয়া আমানত স্বরূপ।

৪. ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিদ্যালয়ের সব আসবাবপত্র আমানত। এগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের কর্তব্য। শিক্ষকদের সম্মান করা, সুন্দরভাবে পড়াশুনা করা ইত্যাদিও শিক্ষার্থীদের নিকট আমানত স্বরূপ।

৫. কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠান আমানত স্বরূপ। ঐ প্রতিষ্ঠানের সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের কর্তব্য।

৬. সরকারের নিকট রাষ্ট্রের সকল সম্পদ ও জনগণের অধিকার আমানত স্বরূপ। এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার না করা খিয়ানত হিসেবে গণ্য।

৭. জনগণের নিকট রাষ্ট্র আমানত স্বরূপ। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা, জাতীয় উন্নয়নের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় করা খিয়ানত হিসেবে গণ্য।

আমানত একটি মহৎগুণ। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে মানুষ আমানত রক্ষা করতে পারে। আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আমানত রক্ষা করতে সচেষ্ট হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আমানত রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

মানবসেবা

পরিচয়

মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি বোঝায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত।

মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কর্তব্য হলো এসব সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া ও তাদের সাথে যথাযথ ব্যবহার করা। পাশাপাশি অন্য মানুষের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করাও মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। কেননা পরস্পরের সেবা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

ইসলামে সবরকমের হক বা অধিকার দু'ভাগে বিভক্ত। তাহলো হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ। হাক্কুল্লাহ হলো আল্লাহ তায়ালার হক। সব রকমের ইবাদত, প্রশংসা, তাসবিহ-তাহলিল এর অন্তর্ভুক্ত। আর হাক্কুল ইবাদ হলো বান্দার হক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসা, সকলের সেবা করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা হাক্কুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। মানবসেবা হলো হাক্কুল ইবাদের অন্যতম দিক।

গুরুত্ব

মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়। মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (স.) বলেন,

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ -

অর্থ : "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" (বুখারি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

অর্থ : "তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (তিরমিযি)

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে থাকেন।" (মুসলিম)

বস্তুত, সকল মানুষ ভাই ভাই। সকলেই আদম (আ.)-এর সন্তান। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের সাহায্য করে আল্লাহ তায়ালাও সে ব্যক্তির সাহায্য করেন, তার বিপদাপদ দূর করেন।

মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। মহানবি (স.) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রুগ্‌ণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণ-গ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।" (বুখারি)

নানাভাবে মানুষের সেবা করা যায়। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অসহায়কে আশ্রয় দান, রোগীর সেবা করা, নিঃস্ব-দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য করার মাধ্যমে মানবসেবা করা যায়। ছোট ও বৃদ্ধদের সাহায্য করা, দয়া-মায়া-মমতা প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখানো মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত।

মানবসেবার প্রতিদান সীমাহীন। আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মানুষের সেবাকারীকে প্রভূত পুরস্কার ও নিয়ামত দান করবেন। মহানবি (স.) বলেন, "কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল দান করবেন। কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করালে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সিলমোহরকৃত পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।" (আবু দাউদ)

আমাদের প্রিয় নবি (স.) মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ছোট-বড়, ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করতেন, সকলের খোঁজ খবর নিতেন। বিপদগ্রস্ত, অভাবীদের সহায়তা করতেন। তাঁর দয়া, মায়া ও সহানুভূতি থেকে তাঁর চরম শত্রুও বঞ্চিত হতো না। রাসুল (স.)-এর জীবনী পাঠ করলে আমরা এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। রাসুল (স.)-কে কষ্টদানকারী বুড়ির ঘটনা আমরা সবাই জানি। এক কাফির বৃদ্ধা প্রতিদিন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। এতে মহানবি (স.)-এর পথ চলতে কষ্ট হতো। তারপরও তিনি বুড়িকে কিছু বলতেন না। একদিন তিনি পথে কাঁটা দেখলেন না। দয়ালু নবি (স.) ভাবলেন, নিশ্চয়ই বুড়ি অসুস্থ। এজন্য পথে কাঁটা দিতে পারেনি। তিনি খুঁজে বুড়ির বাড়ি গেলেন। গিয়ে দেখলেন বুড়ি সত্যিই অসুস্থ। তার সেবা করারও কেউ নেই। নবিজি (স.) বুড়ির শিয়রে বসলেন। তার সেবা-যত্ন করলেন। ফলে বুড়ি ভালো হয়ে উঠল। সে তার অপকর্মের জন্য লজ্জিত হলো। সে আর কোনোদিন পথে কাঁটা দেয়নি।

সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যথাসম্ভব সকল মানুষের সেবা করা।

> **কাজ :** সব শিক্ষার্থী একত্রে বসে একজনকে আলোচক মনোনীত করবে। সে মানবসেবার পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে। আর সকলে তা শুনবে। শিক্ষক সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

পাঠ ৮

ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ভ্রাতৃত্ববোধ হলো ভ্রাতৃত্বসুলভ অনুভূতি প্রকাশ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে ভাইয়ের ন্যায় মনে করা, ভ্রাতৃসুলভ আচার-আচরণ করা। সহোদর ভাইয়ের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করি, সবসময় তাদের কল্যাণ কামনা করি, তাদের জন্য নিজেদের নানা স্বার্থ ত্যাগ করি, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসি। তেমনিভাবে দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি এরূপ মনোভাব পোষণ ও কর্মের মাধ্যমে এর প্রমাণ উপস্থাপনই হলো ভ্রাতৃত্ববোধ।

আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালোবাসা। আমাদের সমাজে বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক বাস করে। তারা এক একটি সম্প্রদায়। সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ জীবনে যথাযথভাবে এগুলোর অনুশীলন করে থাকেন।

ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। এতদুভয়ের অনুপস্থিতিতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, জাতির উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়, এমনকি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়।

ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করে, মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। ফলে মানব সমাজে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকলে মানুষ একে অন্যকে ভালোবাসে না, অন্যের কল্যাণ কামনা করে না। বরং নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। মানুষ একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখে। বিভিন্ন ধর্মের, জাতির ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাসের ফলে দেশীয় সভ্যতাও উন্নততর হয়। সকলের প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে দেশে মারামারি হানাহানির সূত্রপাত ঘটে। অনেক সময় গৃহযুদ্ধও শুরু হয়। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। বস্তুত দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য উপাদান।

ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। এর সকল শিক্ষা ও আদর্শ মানবজাতির জন্য চির কল্যাণকর। এজন্য ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও ইসলাম সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে। ইসলামে এতদুভয় বৈশিষ্ট্য ও গুণ অনুশীলনের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামে সকল মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানগণ বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক, সে কালো হোক বা সাদা,

ধনী হোক কিংবা গরিব সকলেই ভাই-ভাই। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ

অর্থ : "মুমিনগণতো পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১০)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ

অর্থ : "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।" (বুখারি)

বিশ্বের সকল মুসলমান ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তারা পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। একটি হাদিসে মহানবি (স.) মুসলমানদের এ ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "তুমি মুমিনগণকে পারস্পরিক করুণা প্রদর্শন, সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ কষ্ট পায় তখন গোটা দেহই জ্বর ও নিদ্রাহীনতার মাধ্যমে এর প্রতি সাড়া দেয়।" (বুখারি ও মুসলিম)

মুসলমানদের এ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব হলো ইসলামি ভ্রাতৃত্ব। ফলে দুনিয়ার দূরতম প্রান্তে কোনো মুসলমান কষ্টে পতিত হলে অন্য মুসলমানও তার সমব্যথী হয়, তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

মুসলমানগণের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি ইসলাম আরও এক প্রকার ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা প্রচার করেছে। এটি হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব। অর্থাৎ ইসলামের মতে, বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই। এতে দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ ভ্রাতৃত্ব হলো মানুষের মৌলিক ভ্রাতৃত্ব। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কোনো মানুষই এ ভ্রাতৃত্ববোধ লঙ্ঘন করতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا

অর্থ : "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

মহানবি (স.) বলেছেন, وَالنَّاسُ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ

অর্থ : "সকল মানুষই আদম (আ.)-এর বংশধর, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।" (তিরমিযি)

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে সব মানুষ আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। এ হিসেবে সকল মানুষই একই বংশের, একই মর্যাদার ও পরস্পর ভাই-ভাই।

সুতরাং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। সকলকে ভাইয়ের মমতায় দেখতে হবে, বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে, অন্য ধর্ম বা অন্য জাতি বলে কোনো মানুষের প্রতি অবিচার করা যাবে না। বরং সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সকল মানুষের উৎস এক এবং সৃষ্টিগতভাবে সকলেই ভাই-ভাই।

ইহকালীন শান্তির জন্য ভ্রাতৃত্ববোধের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বজায় রাখা অপরিহার্য। সমাজে বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। নিজ সম্প্রদায়ের বাইরের অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সাথেও সদাচরণ করতে হবে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তাদের বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে। পারস্পরিক মারামারি হানাহানির পরিবর্তে শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ আছে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাতে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে এরূপ করবে আমি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করব।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৪)

মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন।

আমরা মুসলমান। আমাদের সমাজে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বহু লোক বসবাস করেন। এদের কেউ আমাদের সহপাঠী, কেউ সহকর্মী, কেউ খেলার সাথি, কেউবা প্রতিবেশী আবার কেউ শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন। তাদের সকলের সাথেই ভালো ব্যবহার করতে হবে। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। মহানবি (স.) বলেছেন,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ-

অর্থ: "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।" (বায়হাকি)

অমুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে না। ধর্ম পালনে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

অর্থ: "তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।" (সূরা আল-কাফিরুন, আয়াত ৬)

অন্য আয়াতে এসেছে, لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

অর্থ: "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৬)

ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। এ জন্য তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না, তাদের সম্পদ দখল করা যাবে না। বরং তাদের জান-মাল-ইজ্জত সংরক্ষণ করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) এ বিষয়ে মুসলিমগণকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।" (বুখারি)

অন্য হাদিসে তিনি বলেন, "সাবধান! যে ব্যক্তি, কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার কোনো সম্পদ নিয়ে যায় তবে কিয়ামতের দিন আমি সে ব্যক্তির প্রতিবাদকারী হব।" (অর্থাৎ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব)। (আবু দাউদ)

ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য নানা বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছে। আমাদের উচিত জীবনের সকল অবস্থায় এসব নির্দেশ অনুশীলন করা। ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক সম্প্রীতির আদর্শে সকলে পরিচালিত হলে এ গোটা বিশ্ব শান্তিময় হয়ে উঠবে।

কাজ : সব শিক্ষার্থী একত্রে বসবে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে চারজন শিক্ষার্থীকে বক্তা নির্ধারণ করবে। তারা ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে বক্তৃতা করবে। শিক্ষক সভাপতি ও সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করবেন। যার বক্তৃতা সবচেয়ে ভালো হবে তাকে সকলে অভিনন্দন জানাবে।

পাঠ ৯

নারীর প্রতি সম্মানবোধ

নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম। এটি একটি মহৎগুণ। নারীর প্রতি সম্মানবোধ ব্যাপক অর্থবোধক। সাধারণ অর্থে এটি নারীকে সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতি বা মনোভাবকে বুঝিয়ে থাকে। আর ব্যাপকার্থে নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব। যেমন, সৃষ্টির বিচারে নর ও নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদান, নারী বলে কাউকে ছোট মনে না করা, নারী হিসেবে কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা। বরং যথাযথভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা, তাদের কাজ করার সুযোগ প্রদান করা, তাদের মাল-সম্পদ, ইজ্জত, সম্মানের সংরক্ষণ করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের প্রকৃত উদাহরণ।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে নারীদের প্রকৃত সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বজগৎ বিশেষ করে আরব সমাজ অজ্ঞতা ও বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সে সময় নারীদের কোনো মান-মর্যাদা ছিল না। তাদের কোনোরূপ অধিকার ছিল না। সেসময় নারীদের দ্রব্যসামগ্রী মনে করা হতো। তাদের ক্রীতদাসী হিসেবে বাজারে কেনাবেচা করা হতো। তারা ছিল ভোগ্যপণ্য, আনন্দদায়ক, প্রেমদায়িনী, সকল ভাঙনের উৎস, নরকের দরজা, অনিবার্য পাপ ইত্যাদি নামে খ্যাত। এমনকি কোনো সভ্যতায় তাদের বিষধর সাপের সাথে তুলনা করা হতো। অনেক সময় নারীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তৎকালীন আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপমানজনক মনে করত ও কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দিত। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ হীন কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে

যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয় ।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৫৮)

ইসলাম নারীদের এহেন অপমানকর অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীদের অবদান ও ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মানুষকে নারীর প্রতি সম্মানবোধের আদেশ করেছে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান

সৃষ্টিগতভাবে ইসলামে নর-নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং মানুষ হিসেবে তারা উভয়ই সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা নর-নারী উভয়ের মাধ্যমেই মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এতে কারও একার কৃতিত্ব নেই। বরং উভয়েই সমান মর্যাদা ও কৃতিত্বের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

অর্থ : "হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

ধর্মীয় স্বাধীনতা, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছে। ধর্মীয় কর্তব্য পালন ও ফল লাভের ক্ষেত্রে নর-নারীতে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ঈমান গ্রহণ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-ই সৎকর্ম করবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ ব্যাপারে কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ১২৪)

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও ইসলাম নারীদের মর্যাদা ও সম্মানের ঘোষণা প্রদান করেছে। মা হিসেবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। রাসুলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেছেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

অর্থ : "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" (মুসনাদে শিহাব আল-কাযায়ি)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, একদা জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা, ঐ সাহাবি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর কোন ব্যক্তি? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মাতা। এভাবে পরপর তিনবার এরূপ প্রশ্ন করলে রাসুল (স.) একই উত্তর দিলেন। চতুর্থবারে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমার পিতা। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের উপর পিতার চাইতেও মাতার অধিকার তিন গুণ বেশি। এটি মা হিসেবে নারীর অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক।

কন্যা হিসেবেও নারীর মর্যাদা অপরিসীম। ইসলাম কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হারাম করেছে। তাদের ভালোভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান স্বামীর অনুরূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : "আর নারীদের তেমনই ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২২৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থ : "তারা (নারীগণ) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৭)

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে। নারীগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হিসেবেও তারা সম্পদ লাভ করবে। তাদের সম্পত্তিতে শুধু তাদেরই কর্তৃত্ব থাকবে। তারা তাদের ধন-সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ, এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।" (সুরা আন-নিসা, আয়াত ৩২)

এভাবে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা ঘোষণা করেছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারীদের এ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে।

নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায়

নারীর প্রতি সম্মানবোধ মানুষের উত্তম মন-মানসিকতার পরিচায়ক। শুধু অন্তর দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা দেখালেই চলবে না বরং নিজ কাজ-কর্ম ও আচার ব্যবহার দ্বারা এর প্রমাণ দিতে হবে। আমাদের পরিবারে ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যেমন মা, মেয়ে, বোন, স্ত্রী, দাদি, ফুফু, খালা রয়েছেন, তেমনি শিক্ষিকা, সহপাঠী ও নারী সহকর্মী রয়েছেন। এদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, যথাযথ শ্রদ্ধা-সম্মান ও মায়া-মমতা প্রদর্শন, জীবন ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের নিদর্শন। আল-কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে আমাদের নানা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ

অর্থ : "অতঃপর তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে।" (মুসলিম)। অর্থাৎ তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না, যথাযথভাবে তাদের হক আদায় করবে। বিদায় হজের ভাষণেও মহানবি (স.) নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

স্ত্রীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : "আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবনযাপন করবে।" (সুরা আন-নিসা, আয়াত ১৯)

রাসুলুল্লাহ (স.) স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহারকারীদের উত্তম উম্মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ-

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" (তিরমিযি)

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও নিজ পরিবারের প্রতি অধিক সদয়।" (তিরমিযি)

বস্তুত নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা মুমিনের নিদর্শন। নারীর প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে ইমান পূর্ণ হয় না।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) নারীদের শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন এবং স্ত্রী ও মেয়েদের ভালোবাসতেন। একদা তিনি সাহাবিগণকে নিয়ে বসা ছিলেন। এ সময় হযরত হালিমা (রা.) তাঁর নিকট আসলেন। হযরত হালিমা ছিলেন মহানবি (স.)-এর দুধমাতা। নবি করিম (স.) তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজ চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। এভাবে প্রিয়নবি (স.) তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখালেন।

কন্যা সন্তান প্রসঙ্গে নবি করিম (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তির কোনো কন্যা সন্তান থাকে আর সে তাকে জীবন্ত কবর দেয় না, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না, অন্য সন্তান অর্থাৎ ছেলে সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয় না, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, "একদা জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের উপর স্ত্রীদের কী অধিকার রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, তুমি যা খাবে তাদেরও তা-ই খাওয়াবে, যা পরিধান করবে তাদেরও তা-ই পরিধান করাবে, তাদের মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, তাদের গালিগালাজ করবে না, আর গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্ন রেখো না।" (আবু দাউদ)

নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম। পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্য এ গুণ থাকা আবশ্যক। অন্তর থেকে নারীদের সম্মান করতে হবে, মায়া-মমতা-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং স্ত্রী ও মেয়েদের ভালোবাসতে হবে। পাশাপাশি নিজ আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারাও এর প্রমাণ দিতে হবে। নারীদের কোনোরূপ অত্যাচার করা যাবে না, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না, ইভটিজিং করা যাবে না, তারা মনে কষ্ট পায় বা তাদের সম্মানহানি হয় এরূপ কোনো কাজ করা যাবে না। বরং সদাসর্বদা তাদের প্রাপ্য ও অধিকার আদায় করতে হবে। প্রয়োজনমতো তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। এভাবে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়। এতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারব।

কাজ :	শিক্ষার্থীরা নারীর প্রতি সম্মানবোধ বিষয়ে ১৫টি বাক্য সম্বলিত একটি পোস্টার বাড়িতে তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ১০

স্বদেশপ্রেম

স্বদেশ হলো নিজ দেশ বা নিজ মাতৃভূমি। যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যে স্থানের আলো-বাতাসে প্রতিপালিত হয় এবং বড় হয়ে উঠে সে স্থানকেই তার স্বদেশ বলা হয়। স্বদেশ হলো কারও জন্মভূমি বা মাতৃভূমি।

স্বদেশের প্রতি মায়া-মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম। নিজ দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত স্বভাব। কেননা মানুষ স্বদেশে জন্ম নেয়, সেখানের আলো-বাতাস গ্রহণ করে, সেখানের ফল-ফসল, খাদ্য-পানীয় দ্বারা তার দেহের পুষ্টি হয়। সেখানকার পরিবেশ, পাহাড়, পর্বত, সাগর-নদী, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য দেখে সে বড় হয়। মানুষের প্রতি স্বদেশ বা মাতৃভূমির অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং স্বভাবগতভাবেই স্বদেশের প্রতি এক ধরনের মায়া-মমতা, ভালোবাসা জন্ম নেয়। এ আকর্ষণ মানুষের অন্তর থেকে উৎসারিত। আজীবন মানুষ এ আকর্ষণ ও ভালোবাসা অনুভব করে। কোনো কারণে দেশ ছেড়ে বাইরে গেলেও দেশপ্রেমের এ অনুভূতি হ্রাস পায় না। বরং স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা সর্বক্ষণই মানবমনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি এ আকর্ষণই স্বদেশপ্রেম।

গুরুত্ব

স্বদেশপ্রেম একটি মহৎ মানবিক গুণ। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ। বলা হয়েছে,

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ

অর্থ : "স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।"

প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসেন। দেশের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করেন। অপরদিকে যারা দেশকে ভালোবাসে না, তারা চরম অকৃতজ্ঞ। তারা দেশদ্রোহী ও জঘন্য চরিত্রের অধিকারী। আর এরূপ ব্যক্তিরা কখনো প্রকৃত ধার্মিক ও মুমিন হতে পারে না।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। কাফিরদের অত্যাচারে তিনি প্রিয় জন্মভূমি মক্কা নগরী ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মক্কা ত্যাগকালে তিনি বারবার অশ্রুসজল নয়নে মক্কার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, "হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার নিজ গোত্রের লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"

দেশপ্রেম ও দেশের সেবা করা ইবাদত স্বরূপ। আল্লাহ্ তায়ালা পরকালে দেশরক্ষীদের বিরাট কল্যাণ দান করবেন। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দেশরক্ষার জন্য সীমান্ত পাহারায় আল্লাহর রাস্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করা দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।" (তিরমিযি)

স্বদেশপ্রেমের উপায়

স্বদেশপ্রেম বা দেশের প্রতি ভালোবাসা অনুভূতির বিষয়। এটি প্রকাশ্যে দেখা যায় না। নিজের কাজ ও সেবার দ্বারা এ ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়। দেশের স্বার্থে কাজ করার দ্বারা দেশপ্রেম প্রমাণিত হয়।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করা, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে কাউকে সাহায্য না করা, দেশের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা ইত্যাদি দ্বারা দেশকে ভালোবাসা যায়। দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করা দেশপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

দেশের মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের জন্য কাজ করাও স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক। দেশের কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নতিতে অবদান রাখার দ্বারাও দেশপ্রেমের নিদর্শন প্রকাশ করা যায়।

আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব। নিজেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানে-গুণে সুন্দর ও যোগ্য করে তুলব। অতঃপর দেশের উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করব। দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ হতে দেব না। দেশের সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করব। অপচয়, অপব্যয় ও বিনষ্ট করব না। দেশের প্রয়োজনে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করব না।

কাজ :	শিক্ষার্থীরা ইসলামের আলোকে স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

কর্তব্যপরায়ণতা

আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম হলো কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও সফলতার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা, দায়িত্বসমূহ পালন করা ইত্যাদি।

মানুষ হিসেবে আমাদের উপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার স্থান রয়েছে এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৩২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে– আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না– যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে।" (সূরা আল-কাহ্ফ, আয়াত ৩০)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, "প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৬৪)

অন্য আয়াতে রয়েছে, "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়– এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৬)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এসেছে,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

অর্থ : "আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৬)

কর্তব্যপরায়ণতার নানা দিক

কর্তব্যপরায়ণতা মানবজীবনে সফলতা লাভের প্রধানতম হাতিয়ার। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য। আমরা সবাই পরিবারের মধ্যে বসবাস করি। সুতরাং পরিবারের সদস্য যথা মাতা-পিতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সকলের প্রতি আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতিও আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। শিক্ষার্থী হিসেবে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীর প্রতি আমাদের নানা কর্তব্য রয়েছে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আসলেও আমাদের পালন করতে হয়। এসব কর্তব্য সঠিক সময়ে যথাযথভাবে পালন করা উচিত। এগুলোর প্রতি সচেতন থাকা ও এগুলো সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়াই কর্তব্যপরায়ণতা।

গুরুত্ব

মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম। যে ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ সকলেই তাঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। তিনি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেন। কর্তব্যপরায়ণতা মানুষকে সফলতা দান করে। ছাত্রজীবনে শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো শিক্ষকদের সম্মান করা, তাঁদের কথা মেনে চলা, ঠিকমতো লেখাপড়া করা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। যে শিক্ষার্থী এসব কর্তব্য ভালোভাবে পালন করে সে সবার ভালোবাসা লাভ করে। শিক্ষকগণ তাকে পছন্দ করেন। সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। ভবিষ্যৎ জীবনেও সে সফলতা লাভ করে। অন্যদিকে যে শিক্ষার্থী কর্তব্যপরায়ণ নয়, তাকে কেউ পছন্দ করে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়।

কর্তব্যপরায়ণতা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি তাঁর সকল কর্তব্য সম্পাদন করেন। আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করার পাশাপাশি তিনি বাস্তবজীবনের সব দায়িত্ব কর্তব্যও পালন করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "তারা কর্তব্য পালন করে এবং সে দিনের ভয় করে যে দিনের অনিষ্ট হবে ব্যাপক।" (সূরা আদ-দাহর, আয়াত ৭)

কর্তব্য কাজে অবহেলা করলে পরকালে সে জন্য জবাবদিহি করতে হবে। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

অর্থ : "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারি)

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য নানা দায়িত্ব কর্তব্য দিয়েছেন। পরকালে তিনি আমাদের সকলকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। সেদিন কর্তব্যপরায়ণগণ সহজেই মুক্তি লাভ করবে। তাদের জন্য রয়েছে সফলতা ও জান্নাত। অন্যদিকে যারা দুনিয়াতে কর্তব্যকাজে অবহেলা করেছে, ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেনি তারা বিপদগ্রস্ত হবে। তারা শাস্তি ভোগ করবে। তাদের জন্য রয়েছে চিরশাস্তির জাহান্নাম।

আমরা কর্তব্যপরায়ণ হতে সচেষ্ট হব। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করব। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করব।

কাজ: শিক্ষার্থীরা পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে যে কাজের মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে পারে- তার একটি তালিকা প্রণয়ন করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১২
পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে পরিচ্ছন্নতা বলে। শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সুন্দর ও পবিত্র রাখা, ময়লা-আবর্জনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত রাখাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। দুর্নীতিমুক্ত, ভেজালমুক্ত ও ঝামেলামুক্ত অবস্থাও পরিচ্ছন্নতার অন্যতম রূপ। পরিচ্ছন্নতার আরবি প্রতিশব্দ হলো নাজাফাত (اَلنَّظَافَةُ)। ইসলামি শরিয়তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্থে সাধারণত তাহারাত শব্দটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়ত নির্দেশিত পদ্ধতিতে দেহ, মন, পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান ও পরিবেশ পরিষ্কার ও নির্মল রাখাকে তাহারাত বলা হয়।

গুরুত্ব

মানবজীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিচ্ছন্ন থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। নোংরা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা ঈমানদারগণের স্বভাব নয়। বরং মুমিনগণ সদা সর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ অর্থ: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" (মুসলিম)

প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্য পবিত্র থাকা অপরিহার্য। কেননা পবিত্রতা ব্যতীত কোনো ইবাদত কবুল হয় না। সালাত আদায়ের জন্য মানুষের শরীর, পোশাক ও সালাতের স্থান পরিষ্কার ও পবিত্র হতে হয়। এগুলো নাপাক থাকলে সালাত শুদ্ধ হয় না। তেমনি আল-কুরআন তিলাওয়াতের জন্যও পাক-পবিত্র হতে হয়। অপবিত্র অবস্থায় আল-কুরআন স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۝
অর্থ: "আর এটা (আল-কুরআন) পবিত্রগণ ব্যতীত আর কেউ স্পর্শ করবে না।" (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, আয়াত ৭৯)

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সবাই ভালোবাসে। আল্লাহ তায়ালাও তাদের ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২২)

ইসলামি শরিয়তে পরিষ্কার-পবিত্র থাকার জন্য ওযু, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান প্রদান করা হয়েছে। দৈনিক পাঁচবার সালাতের পূর্বে ওযু করার দ্বারা মানুষের সকল অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা দূরীভূত হয়।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা হলো হাত, পা, মুখ, দাঁত ও গোটা শরীর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা। কারও হাত, পা, মুখ, দাঁত, তথা গোটা শরীর অপরিষ্কার ও ময়লাযুক্ত থাকলে তা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। এসব ময়লা, দুর্গন্ধ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। কেননা অপরিচ্ছন্ন মানুষকে সকলে ঘৃণা করে। গোসল করার দ্বারা আমরা নিজেদের শরীর পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি। শরীরের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করতে পারি।

রাতের বেলা ঘুমানোর পর সকালে আমাদের মুখমণ্ডল পরিচ্ছন্ন, সতেজ ও নির্মল থাকে না। চোখে পিঁচুটি লেগে থাকে, দাঁত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। খাদ্য গ্রহণ করলেও আমাদের দাঁতে ময়লা লাগে। সুতরাং দাঁত মুখ সদা-সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) দাঁত পরিষ্কারের জন্য মিসওয়াক করতেন। আমাদেরও তিনি মিসওয়াক করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার উম্মতের কষ্টের আশঙ্কা না করলে আমি তাদের প্রত্যেক সালাতের আগে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।" (বুখারি)

আমাদের অনেকে চুল ও নখ বড় রাখে। এতে দেখতে খারাপ লাগে। নখ বড় হলে এতে ময়লা জমে। অতএব, নখ কেটে ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। চুল পরিপাটি করে রাখতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান। মহানবি (স.) একবার এলোমেলো চুলের এক লোককে দেখে বললেন, এ ব্যক্তি কি চুল ঠিক করার কিছু পেল না?

প্রস্রাব-পায়খানা করে ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়াও ইসলামের বিধান। এজন্য প্রথমে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে। এখন সহজলভ্য টিস্যু ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। অতঃপর পানি ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন, "নিশ্চয় প্রস্রাবই বেশির ভাগ কবর আযাবের কারণ হয়ে থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ)

অপর একটি হাদিসে এসেছে, "তোমরা প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা থেকে বেঁচে থাক। কারণ কবরের বেশিরভাগ আযাব প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা থেকে বেঁচে না থাকার কারণে হবে।" (দারাকুতনি)

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব সীমাহীন। সুতরাং আমরা প্রতিদিন গোসল করব। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে ভালোভাবে ওযু করব। আমাদের হাত, পা, নখ, চুল, দাঁত, চোখ সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

পোশাকের পরিচ্ছন্নতা

দৈহিক পরিচ্ছন্নতার মতো পোশাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার থাকলে দেহ মন ভালো থাকে, কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ অর্থ : "আর আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।" (সূরা আল মুদ্দাসসির, আয়াত ৪)

২০২৫

আমাদের প্রিয়নবি (স.) সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতেন। কাপড়-চোপড় অল্প মূল্যের হতে পারে, ছেঁড়া ফাটা হতে পারে, কিন্তু তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। এজন্য সবসময় কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা

আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, হাট-বাজার, স্কুল-মাদ্রাসা, দোকানপাট, রাস্তাঘাট এসবই আমাদের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের কর্তব্য। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকলে নির্মল জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়।

যেখানে সেখানে কফ-থুথু, মলমূত্র ফেললে পরিবেশ নোংরা হয়। বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট, ময়লা-আবর্জনা, রাসায়নিক বর্জ্য ডাস্টবিনে না ফেলে রাস্তাঘাটে ফেলা উচিত নয়। এতে রাস্তাঘাট ময়লা হয়। নোংরা-আবর্জনা আমাদের শরীরে ও পোশাকে লাগে। নানা রকম রোগজীবাণু জন্মে। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

পানি ও বায়ু পরিবেশের অন্যতম উপাদান। এ দুটো মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পানি পান করি, পানিতে গোসল করি, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করি। সুতরাং পানি ও বায়ু সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। পানিতে ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না। অনেকে পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করে। এটা ঠিক নয়। আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মলত্যাগ করব। ফলে আমাদের বায়ুও দুর্গন্ধযুক্ত হবে না।

পরিবেশ আমাদের। এ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক হব। আমাদের ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখব। সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাব। যানবাহন, বাসস্টেশন, ফেরিঘাট, খেলার মাঠ, হাট-বাজারও পরিষ্কার রাখা দরকার। আমরা এ ব্যাপারেও সচেষ্ট হব। এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সাহায্য করব।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা শরীর, পোশাক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ৫টি করে মোট ১৫টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৩

মিতব্যয়িতা

মিতব্যয়িতা আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম দিক। মিতব্যয়িতা হলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা, পরিমিতিবোধ, কথা-বার্তা, কাজ-কর্মে যথার্থতা, মাল-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি। সাধারণত ধন-সম্পদের যথাযথ ও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারকে মিতব্যয়িতা বলা হয়। অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খরচ করা, কম বা বেশি না করা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি আমাদের বহু নিয়ামত দান করেছেন। এ সমস্ত নিয়ামত ও ধন-সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। এক্ষেত্রে অপব্যয়-অপচয় বা কৃপণতা করা যাবে না। বরং যখন যা প্রয়োজন সেরূপ ব্যয় করার মধ্যেই সফলতা রয়েছে। প্রয়োজনমাফিক সম্পদের এই ব্যবহারই মিতব্যয়িতা; এটি অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি পন্থা।

মিতব্যয়িতার গুরুত্ব

মিতব্যয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ। এটি মানবসমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। পক্ষান্তরে কৃপণতা ও অপচয় সমাজে নানা অশান্তির সৃষ্টি করে। অপচয়কারীর সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সে নানা অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। অন্যদিকে কৃপণতা মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য ও শত্রুতার জন্ম দেয়। সমাজে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। মিতব্যয়িতা মানুষকে অপচয় ও কৃপণতার কুফল থেকে রক্ষা করে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِيْ مَعِيْشَتِهِ অর্থ : "ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।" (মুসনাদে আহমাদ)

মিতব্যয়ী ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করেন। ফলে তিনি বহু সাওয়াবের অধিকারী হন। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৎকাজে খরচ কর, তবে তোমার কল্যাণ হবে। আর যদি তা আটকে রাখ তবে তোমার অকল্যাণ হবে। তবে তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তোমাকে তিরস্কার করা হবে না।" (তিরমিযি)

মিতব্যয়িতা মুমিনের গুণ। প্রকৃত ইমানদারগণ শুধু নিজ প্রয়োজনমাফিক খরচ করেন। তারা কৃপণতাও করেন না। আবার অপচয়ও করেন না। তাঁরা মিতব্যয়ী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেন। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○

অর্থ : "আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬৭)

আল্লাহ আরও বলেন, "তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৯)

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন মিতব্যয়িতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর ও পরিবারের জন্য প্রয়োজনমাফিক খরচ করতেন। এতে তিনি যেমন আরাম আয়েশ ও বিলাসিতা করতেন না তেমনি কৃপণতাও করতেন না। অতিরিক্ত সম্পদ তিনি দান করে দিতেন। সাহাবিগণ, ওলিগণের জীবনী থেকেও আমরা এ শিক্ষা লাভ করি। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত করা হয়েছে, তার প্রয়োজনমাফিক জীবনোপকরণ আছে এবং সে এতে তুষ্ট রয়েছে।" (তিরমিযি)

মিতব্যয়িতা মানুষকে নানা সৎগুণে ভূষিত করে। লোভ-লালসা, অপচয়-অপব্যয়, কৃপণতা, অলসতা, আরামপ্রিয়তা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। মিতব্যয়িতা আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয়। আমরা সকলে জীবনযাপনে মিতব্যয়ী হব। সবধরনের অপচয়, কৃপণতা ও বিলাসিতা থেকে দূরে থাকব। তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর হবে।

কাজ : শিক্ষার্থী মিতব্যয়িতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের দুটি করে বাণী খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৪

আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাকেও আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

আত্মশুদ্ধির আরবি পরিভাষা হলো 'তাযকিয়াতুন নাফস'। একে সংক্ষেপে 'তাযকিয়াহ'ও বলা হয়। স্বীয় আত্মাকে সবধরনের পাপ-পংকিলতা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রাখাই তাযকিয়াহ-এর উদ্দেশ্য।

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুত দেহ ও অন্তরের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। দেহ হলো মানুষের হাত-পা, মাথা, বুক ইত্যাদি নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। আর অন্তর হলো আত্মা বা কাল্‌ব। এ দুটোর মধ্যে কাল্‌বের ভূমিকাই প্রধান। মানুষের অন্তর যেরূপ নির্দেশনা প্রদান করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তদ্রূপই কাজ করে থাকে। সুতরাং মানুষের কাজকর্মের শুদ্ধতার জন্য প্রথমেই কাল্‌বের সংশোধন প্রয়োজন। আর কাল্‌বের সংশোধনই হলো আত্মশুদ্ধি। কাল্‌ব যদি সৎ ও ভালো কাজের নির্দেশ দেয় তবে দেহও ভালো কাজ করে। একটি হাদিসে মহানবি (স.) সুন্দরভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "জেনে রেখো! শরীরের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে। যদি তা সংশোধিত হয়ে যায়, তবে গোটা শরীরই সংশোধিত হয়। আর যদি তা কলুষিত হয়, তবে গোটা শরীরই কলুষিত হয়ে যায়। মনে রেখো তা হলো কাল্‌ব বা অন্তর।" (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র। তিনি পবিত্রতা ব্যতীত কোনো জিনিসই কবুল করেন না। সুতরাং ইবাদতের জন্যও দেহ-মন পবিত্র হওয়া আবশ্যক। দৈহিক পবিত্রতা লাভ করলেই হবে না বরং অন্তরকেও পবিত্র করতে হবে। অন্য সবকিছু থেকে মনকে পবিত্র রেখে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করতে হবে। আর অন্তর-আত্মার পবিত্রতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

মানুষের আত্মিক প্রশান্তি, উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্যও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মশুদ্ধি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। সদা সর্বদা ভালো চিন্তা ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। আত্মশুদ্ধি মানুষের চরিত্রে প্রশংসনীয় গুণাবলি চর্চার সুযোগ করে দেয়। পক্ষান্তরে যার আত্মা কলুষিত সে নানাবিধ পাপ চিন্তা ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকে। সে অন্যায়-অত্যাচার, সন্ত্রাস-নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাও বিনষ্ট হয়। অতএব, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা ও বিকাশের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

আত্মশুদ্ধি মানুষকে বিকশিত করে, সফলতা দান করে। ইহজীবনে আত্মশুদ্ধি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে। এরূপ মানুষ সবধরনের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে, সকল পাপাচার ও অনৈতিক কাজ থেকে

দূরে থাকে। ফলে সমাজে সে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে।

বস্তুত আত্মশুদ্ধি হলো সফলতা লাভের মাধ্যম। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে ব্যর্থ সে দুর্ভাগা। সে কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখবে সেই সফলকাম হবে, আর সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে।" (সূরা আশ-শামস, আয়াত ৯-১০)

পরকালীন জীবনের সফলতা এবং মুক্তিও আত্মশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ আত্মাকে পবিত্র রাখবে পরকালে সেই মুক্তি লাভ করবে। তার জন্য পুরস্কার হবে জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

অর্থ : "সেদিন ধনসম্পদ কোনো কাজে আসবে না, আর না কাজে আসবে সন্তান-সন্ততি। বরং সেদিন সে ব্যক্তিই মুক্তি পাবে, যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে।" (সূরা আশ-শুআরা, আয়াত ৮৮-৮৯)

মূলত ইহ ও পরকালীন সফলতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এজন্যই ইসলামে আত্মশুদ্ধির প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আত্মশুদ্ধির উপায়

মানুষের অন্তর হলো স্বচ্ছ কাঁচের মতো। যখনই মানুষ কোনো খারাপ কাজ করে তখনই তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। এভাবে বারংবার পাপ কাজ করার দ্বারা মানুষের অন্তর পুরোপুরি কলুষিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেছেন,

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

অর্থ : "কখনোই নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে।" (সূরা আল-মুতাফফিফিন, আয়াত ১৪)

মানুষের কাজের কারণেই মানুষের অন্তর কলুষিত হয়। সুতরাং আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায় হলো খারাপ কাজ ত্যাগ করা এবং কুচিন্তা, কুঅভ্যাস বর্জন করা। সদাসর্বদা সৎকর্ম, সৎচিন্তা, নৈতিক ও মানবিক আদর্শে নিজ চরিত্র গড়ে তোলার দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

মহানবি (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক বস্তুরই পরিশোধক যন্ত্র রয়েছে। আর অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র হলো আল্লাহর যিকির।" (বায়হাকি)

বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের কালো দাগ ও মরিচা দূর করা যায়। যিকিরের মাধ্যমে আত্মা প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। এ ছাড়াও তওবা, ইস্তিগফার, তাওয়াক্কুল, যুহদ, ইখলাস, সবর, শোকর, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ইত্যাদির মাধ্যমেও আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

আমরা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করব, আত্মশুদ্ধি অর্জন করব এবং মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হব।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ নিজের খাতায় বাড়ি থেকে লিখে আনবে এবং শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৫

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এর আরবি পরিভাষা হলো 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার'। ইসলামি জীবনদর্শনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য। সৎকাজের আদেশ বা 'আমর বিল মারুফ' বলতে সাধারণত কাউকে কোনোরূপ ন্যায় ও ভালো কাজের নির্দেশ দান করা বোঝায়। তবে ব্যাপকার্থে কোনো ব্যক্তিকে ইসলামসম্মত কাজের নির্দেশ দেওয়া, উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা, অনুরোধ করা, পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি সবই সৎকাজের আদেশের মধ্যে গণ্য। অসৎকাজে নিষেধ বা 'নাহি আনিল মুনকার' হলো যাবতীয় মন্দ, খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখা। যেসব কাজ ইসলাম সমর্থন করে না এবং যেসব কাজ নীতি-নৈতিকতা ও বুদ্ধি-বিবেকবিরোধী সেসব কাজ থেকে কাউকে নিষেধ করা, বিরত রাখা, নিরুৎসাহিত করা, বাধা দেওয়া ইত্যাদি 'নাহি আনিল মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। শুধু মৌখিক নিষেধের দ্বারা নয় বরং নানাভাবেই অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যায়। একটি হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ কাজ হতে দেখে তবে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিরোধ করে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখের দ্বারা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাও না রাখে তবে সে যেন অন্তর দ্বারা এর প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। আর এটা হলো ইমানের দুর্বলতম স্তর।" (মুসলিম)

এ হাদিসে মহানবি (স.) হাত, মুখ ও অন্তর দ্বারা 'নাহি আনিল মুনকার' বা খারাপ কাজ প্রতিরোধ করার কথা বলেছেন। হাদিস বিশারদগণের মতে, হাত দ্বারা বলতে এখানে নিজ শক্তি ক্ষমতা ও প্রভাব দ্বারা প্রতিরোধ করার কথা বোঝায়। মুখ দ্বারা প্রতিরোধ হলো নিষেধ করা, নিরুৎসাহিত করা, জনমত গঠন করে প্রতিরোধ করা। আর অন্তর দ্বারা প্রতিরোধ হলো মনে মনে ঐ কাজকে ঘৃণা করা, ঐ কাজ বন্ধ হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা, প্রতিরোধের জন্য চিন্তা করা, পরিকল্পনা করা এবং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অন্তরে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকা ইত্যাদি। নানাভাবে মানুষকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করাই নাহি আনিল মুনকার।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার জন্য সবসময়ই কিছুসংখ্যক লোক থাকতে হয়। অন্যথায় সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। সমাজে অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস, নির্যাতন ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়ে যায়। সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার জন্য এরূপ লোকদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করা অত্যন্ত মহৎ কাজ। এ মহৎ কাজ যারা সম্পাদন করবেন আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করবেন। পবিত্র কুরআনে সৎকাজের আদেশদানকারী এবং অসৎকাজের নিষেধকারীকে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

অর্থ : "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য। এ কাজ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

অর্থ : "আর তারা এমন লোক, আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর কর্মের প্রতিফলতো আল্লাহরই নিকট।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৪১)

সৎকাজের আদেশ সমাজে সৎ ও ন্যায় কার্যাবলির প্রসার ঘটায়। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সদাচরণ ও নৈতিক গুণাবলি বিকশিত হয়। আর অসৎ কাজের নিষেধ সমাজ থেকে অন্যায়, অশ্লীলতা ও নির্যাতনের মূলোৎপাটন করে। মানুষ এর মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বুঝতে শিখে ও ধীরে ধীরে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে। অন্যদিকে সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ না থাকলে সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। একটি হাদিসে মহানবি (স.) একটি উপমার মাধ্যমে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমালংঘনকারীদের উদাহরণ হলো একদল লোকের ন্যায়, যারা জাহাজের যাত্রী। লটারির মাধ্যমে এদের একদল উপর তলায় ও অপর দল নিচতলায় স্থান পেল। নিচতলার লোকজন পানির প্রয়োজন হলে উপর তলার লোকদের নিকট পানি আনতে যায়। এমতাবস্থায় তারা (নিচতলার লোকজন) বলল, আমরা যদি নিচেই একটা ছিদ্র করে নেই তবে উপর তলার লোকদের কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি তারা (উপর তলার লোকজন) তাদের বাধা দেয় তবে নিজেরাও বাঁচতে পারে এবং সবাইকে বাঁচাতে পারবে।" (বুখারি)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ মানুষকে ধ্বংসে থেকে বিরত রাখে। এতে সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে আরও গভীরভাবে সৎকাজে উৎসাহী হয়। নিজ জীবনে সে ব্যক্তি সকল অন্যায় ও অসুন্দর কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার ত্যাগের পরিণতি

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা আবশ্যকীয় কর্তব্য। এ কর্তব্যে অবহেলা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি। আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াতেই এ জন্য শাস্তি প্রদান করেন। আর পরকালে এরূপ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদেরকে দাউদ (আ.) ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল ও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিল। তারা পরস্পরকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখত না। বস্তুত অত্যন্ত জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল।" (সুরা আল-মায়িদা, আয়াত ৭৮-৭৯)

মহানবি (স.) বলেছেন, "লোকেরা যখন কোনো অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখে, কিন্তু তারা তার হাত ধরে না (প্রতিরোধ করে না) এরূপ লোকদের উপর অচিরেই আল্লাহ্ শাস্তি পাঠাবেন।" (তিরমিযি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দেবেন। তখন তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না।" (তিরমিযি)

প্রকৃতপক্ষে, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার মানব জীবনের অপরিহার্য কাজ। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা এর উপরই নির্ভরশীল। তবে অন্যকে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করে বসে থাকলে চলবে না। বরং নিজেও তদনুযায়ী আমল করতে হবে। কেননা নিজে আমল না করে অন্যকে আদেশ দিলে পরকালে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসবে। সে এটা নিয়ে চারপাশে চক্কর দিতে থাকবে যেমনভাবে গাধা চক্রের মধ্যে ঘুরে থাকে। তখন জাহান্নামিরা তার চারপাশে সমবেত হবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি সৎকাজের আদেশ দিতে না এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে না? উত্তরে সে বলবে, হ্যাঁ আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর অন্যদের খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকতাম না।" (বুখারি ও মুসলিম)

অতএব, আমরা নিজেরা সৎকাজ করব ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকব। অতঃপর নিজ পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, প্রতিবেশী, সকলকে সৎকাজে উৎসাহিত করব। সৎকাজে সাহায্য-সহযোগিতা করব। আর অসৎকাজ থেকে তাদের বিরত রাখতে চেষ্টা করব। আমাদের সমাজে প্রচলিত অন্যায়, অসত্য ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। সকলে মিলে সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করে সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনে সচেষ্ট হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সম্পর্কে ১৫টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৬

আখলাকে যামিমাহ

পরিচয়

আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় স্বভাব। মানুষের সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ভালো নয়। বরং মানব চরিত্রে এমন কিছু দিক রয়েছে যা অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। মানব চরিত্রের এসব নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়। আখলাকে যামিমাহ হলো আখলাকে হামিদাহ-র সম্পূর্ণ বিপরীত। আখলাকে যামিমাহ-র অপর নাম আখলাকে সায়্যিআহ। আখলাকে সায়্যিআহ অর্থ অসৎচরিত্র, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি।

মানব চরিত্রে বহু নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- মিথ্যা বলা, প্রতারণা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপব্যয়-কৃপণতা, ক্রোধ, গর্ব-অহংকার ইত্যাদি। এসব স্বভাব আখলাকে যামিমাহ-র অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা আখলাকে যামিমাহ এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব।

কুফল বা অপকারিতা

মানব সমাজে আখলাকে যামিমাহ-র কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি যেমন ব্যক্তি জীবনে অশান্তি ডেকে আনে তেমনি সমাজ জীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অসৎচরিত্র বা চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম। তার মধ্যে নীতি, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না। সে শুধু গড়ন-আকৃতিতে মানুষ, কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র হয় পশুর ন্যায়। নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য সে মানবিক আদর্শসমূহকে বিসর্জন দেয়। আখলাকে যামিমাহ-র ফলে সে সবরকমের অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি হত্যা-রাহাজানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিতেও জড়িয়ে পড়ে। ফলে শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সমাজে অরাজকতা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করে।

মন্দ চরিত্রের মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র। কেউ তাকে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে, এড়িয়ে চলে। তার বিপদাপদেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। অসৎচরিত্র মানুষকে পরকালীন জীবনে শোচনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। চরিত্রহীন ব্যক্তি সকল প্রকার পাপাচারে লিপ্ত থাকে, সে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়। আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালোবাসেন না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এরূপ অসৎচরিত্র ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। মহানবি (স.) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ

অর্থ : "দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (আবু দাউদ)

বস্তুত আখলাকে যামিমাহ অত্যন্ত ঘৃণিত ও বর্জনীয় স্বভাব। এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকলেরই এসব স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

আমরা অসৎচরিত্র ত্যাগ করে সৎচরিত্র অবলম্বন করব। সত্যিকার মানুষ হিসেবে সকলের প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করব।

পাঠ ১৭

প্রতারণা

পরিচয়

প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। ইসলামি পরিভাষায়, প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়।

প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ওজনে কম দেওয়া, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া, বেশি দামের দ্রব্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, ফলে ও মাছে রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের মিথ্যা প্রচারণা চালানো ইত্যাদি।

এ ছাড়াও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতারণা হতে পারে। যেমন, পরীক্ষায় নকল করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অন্যের হক নষ্ট করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভুল ও মিথ্যা তথ্য দেওয়া, পথচারীকে ভুল রাস্তা বলে দেওয়া, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ, এমনকি নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করাও প্রতারণার শামিল।

প্রতারণা বর্জনের গুরুত্ব

প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়। কেননা ইমান ও প্রতারণা এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রে থাকতে পারে না। প্রকৃত মুমিন কখনোই প্রতারণার আশ্রয় নেন না। নিজ স্বার্থের বিরোধী হলেও মুমিন ব্যক্তি সততা ও সত্যবাদিতার উপর অটল থাকেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) বলেছেন, "যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমার উম্মত নয়। আর যে কারও সাথে প্রতারণা করে সে মুসলিম দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম)। রাসুলুল্লাহ (স.) অন্য হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا অর্থ : "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযি)

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা জায়েজ নয়। কোনো কাজেই প্রতারণা করা যাবে না, সত্য- মিথ্যার মিশ্রণ করা যাবে না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : "আর তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ৪২)

ব্যবসা-বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্য সঠিকভাবে লেনদেন করতে হবে। পণ্যের দোষ ত্রুটি ক্রেতার নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে হবে। পণ্যের সঠিক অবস্থা না জানিয়ে লেনদেন করা প্রতারণা, এটা হারাম বা অবৈধ। একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, "একদা রাসুলুল্লাহ (স.) একটি খাদ্যদ্রব্যের স্তূপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় তিনি স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, স্তূপের ভিতরের দ্রব্য ভিজা ও বাইরেরগুলো শুকনো। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কী? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! বৃষ্টির দরুন এগুলো ভিজে গেছে। অতঃপর রাসুল (স.) বললেন, তবে তুমি ভিজা খাদ্যশস্য কেন উপরে রাখলে না? তাহলে ক্রেতারা এর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারত (ফলে প্রতারিত হতো না।)। বস্তুত যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।" (মুসলিম)

প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এর দ্বারা পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতা জন্ম নেয়। প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে যেমন মানবসমাজে ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ্ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।" (ইবনে মাজাহ)

প্রকৃতপক্ষে, প্রতারণাকারী দুনিয়াতেও ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। আর আখিরাতে তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও ধ্বংস। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

অর্থ : "ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তারা মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।" (সূরা আল-মুতাফফিফিন, আয়াত ১-৩)

প্রতারণা আখলাকে যামিমাহ্-র অন্যতম। এটি মারাত্মক অপরাধ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব, আমাদেরকে সকল কথা ও কাজে প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতারণা বর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৮
গিবত

পরিচয়

গিবত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। প্রচলিত অর্থে অসাক্ষাতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলা হয়।

একটি হাদিসে মহানবি (স.) সুন্দরভাবে গিবতের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। একদা নবি (স.) বললেন, তোমরা কি জানো গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, "গিবত হলো-তুমি তোমার ভাইয়ের এমনভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলা হলো, আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গিবত হবে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ।" (মুসলিম)

গিবতের স্বরূপ

আমরা অনেক সময় অলস বসে থাকি। হাতে কোনো কাজ থাকে না। বন্ধুবান্ধব মিলে গল্প করি। এসময় কথায় কথায় অন্যের সমালোচনা করি। সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের দোষ খুঁজে বেড়াই। তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি। বস্তুত এসবই গিবত। ঠাট্টাচ্ছলে গল্প করার সময় এসব কথার দ্বারা অনেক বড় গুনাহ হয়। তবে শুধু কথার মাধ্যমেই নয় বরং আরও নানা ভাবে গিবত হতে পারে। যেমন, লেখনীর মাধ্যমে, ইশারা-ইঙ্গিতে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কারও সমালোচনা করা। কারও কোনো অভ্যাস নিয়ে চিত্র, লেখা বা কার্টুনের মাধ্যমেও গিবত করা যায়।

কারও কোনো দোষ আলোচনা করা গিবতের সবচেয়ে পরিচিত রূপ। এ ছাড়াও শারীরিক দোষ-ত্রুটি, পোশাক-পরিচ্ছদের সমালোচনা, জাত-বংশ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, কারও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস নিয়ে সমালোচনা করা ইত্যাদি গিবতের অন্তর্ভুক্ত।

গিবতের কুফল ও পরিণাম

ইসলামি শরিয়তে গিবত বা পরনিন্দা করা অবৈধ। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ

অর্থ : "আর তোমরা একে অন্যের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অপছন্দ করে থাকো।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২)

গিবত করাকে আল-কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং গিবত খুবই অপছন্দনীয় কাজ। সুস্থ বিবেকবান কোনো মানুষই এরূপ কাজ পছন্দ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালাও গিবত করা পছন্দ করেন না।

পবিত্র হাদিসে মহানবি (স.) আমাদের গিবতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "গিবত ব্যভিচারের চইতেও মারাত্মক। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! গিবত কীভাবে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক অপরাধ হয়? রাসুল (স.) বললেন, কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গিবতকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করবেন না, যতক্ষণ না যার গিবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি মাফ করবে।" (বায়হাকি)

ইসলামি শরিয়তে গিবত সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারও গিবত করা যেমন হারাম তেমনি গিবত শোনাও হারাম। গিবত না করার পাশাপাশি গিবত শোনা থেকেও বিরত থাকতে হবে। গিবতকারীকে গিবত বলা থেকে বিরত থাকার জন্য বলতে হবে। নতুবা যেসব স্থানে গিবতের আলোচনা হবে সেসব স্থান এড়িয়ে চলতে হবে।

গিবতের পাপ অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা অনেক সময় এমন ব্যক্তির গিবত করে থাকি যার নিকট ক্ষমা চাওয়ারও সুযোগ নেই। ফলে গিবতের এ পাপ আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। সুতরাং আমরা গিবত করা থেকে বিরত থাকব। যদি কোনো কারণে তা হয়ে যায় তবে সাথে সাথে গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা গিবতের পরিচয়, কুফল ও পরিণাম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাড়ি থেকে লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৯

হিংসা

হিংসা আখলাকে যামিমাহ-র অন্যতম দিক। হিংসা-বিদ্বেষ মানে অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ঘৃণা করা, শত্রুতাবশত অন্যের ক্ষতি কামনা করা, অন্যের উন্নতি, সুখ সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় অন্যের সুখ-সম্পদ, শান্তি-সাফল্য ধ্বংস হওয়া ও নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলা হয়। আরবি ভাষায় হিংসার প্রতিশব্দ হলো হাসাদ (اَلْحَسَدُ)।

হিংসার কুফল

হিংসা-বিদ্বেষ মানব চরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। এটি মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি কখনোই সৎচরিত্রবান হতে পারে না। কেননা গর্ব-অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি হিংসার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হিংসুক ব্যক্তির মধ্যে এসব অভ্যাসও গড়ে ওঠে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সকলের সাথে সে মিলেমিশে চলে। সামাজিক শান্তিই তার প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক শান্তির জন্য প্রয়োজন সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, "পরস্পর কল্যাণকামিতাই হলো দীন।" হিংসা এসব সৎগুণ ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে, নিজের স্বার্থকে সবচেয়ে বড় করে দেখে। সে অন্যকে ঘৃণা করে, অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, অন্যের অনিষ্ট কামনা করে। এতে মানবসমাজে ঐক্য, সংহতি বিনষ্ট হয়, শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।

হিংসা-বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভেদ বৈষম্য দেখা দেয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এতে মুসলিম জাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুণ্ডনকারী (ধ্বংসকারী) রোগ– ঘৃণা ও হিংসা তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি চুল মুণ্ডনের কথা বলছি না, বরং তা হলো দীনের মুণ্ডনকারী।" (তিরমিযি)

হিংসা বিদ্বেষ পরকালীন জীবনেও মানুষের ক্ষতির কারণ। হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস

করে দেয়। মহানবি (স.) বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ : "তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)।" (আবু দাউদ)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী।" (আদাবুল মুফরাদ)

হিংসার ব্যাপারে ইসলামের বিধান

ইসলামি শরিয়তে হিংসা বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনোই হিংসুক হতে পারে না। বরং অন্যের কল্যাণ কামনা ও পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা হিংসা থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

অর্থ : "আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে (পানাহ চাই) যখন সে হিংসা করে।" (সূরা আল-ফালাক, আয়াত ৫)

মহানবি (স.) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর হিংসা করবে না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না ও পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। বরং সবাই আল্লাহর বান্দা, ভাই-ভাই হয়ে থাকবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

হিংসা-বিদ্বেষ অত্যন্ত মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এটি মানুষের নেক আমল ও সৎচরিত্রসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। ব্যক্তিগত সাফল্য ও জাতীয় উন্নতির জন্য সকলেরই হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা উচিত।

কাজ :	শিক্ষার্থীরা হিংসার কুফল সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর একটি বাণী লিখে পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ২০

ফিতনা-ফাসাদ

পরিচয়

ফিতনা ও ফাসাদ উভয়টি আরবি শব্দ। ফিতনা (اَلْفِتْنَةُ) অর্থ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, কলহ ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি বুঝায়। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা-ফাসাদ। মানবসমাজে ভয়-ভীতি, অত্যাচার-অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয়

সৃষ্টি করা যায়। এরূপ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিই ফিতনা-ফাসাদ। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, খুন, অপহরণ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ফিতনা-ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, কলহ, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিও ফিতনা-ফাসাদের অন্যরূপ।

কুফল

ইসলাম শান্তির ধর্ম, সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবন ব্যবস্থা। এতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কোনো স্থান নেই। বরং ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি ইসলামের ভিত্তি। ইসলামের সকল আচার-আচরণ, বিধি-বিধান বিজ্ঞানসম্মত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। জামাআতে সালাত আদায় এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো সবাই সারিবদ্ধভাবে এক ইমামের নেতৃত্বে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। সকলে একই সাথে রুকু-সিজদাহ করে, সালাত আদায় করে। এতে শৃঙ্খলাহীনতার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য বিধি-বিধানও তদ্রূপ। এমনকি এ গোটা মহাবিশ্বও আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত সুশৃঙ্খল পন্থায় পরিচালিত। কোথাও কোনোরূপ অরাজকতা ও অব্যবস্থাপনা নেই।

আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনও এরূপ শৃঙ্খলাপূর্ণ হওয়া উচিত। এটাই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু ফিতনা-ফাসাদ এ লক্ষ্য পূরণের প্রধান অন্তরায়। ফিতনা-ফাসাদের ফলে জীবনের সর্বস্তরেই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে না। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। ফিতনা-ফাসাদ সমাজে ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের জন্ম দেয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। এককথায়, ফিতনা-ফাসাদের ফলে সমাজে ও দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। শান্তি ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

বস্তুত ফিতনা-ফাসাদ অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে সকল অন্যায়-অত্যাচারের দরজা খুলে যায়। অরাজক পরিস্থিতিতে অসৎ মানুষেরা সব ধরনের পাপ কাজের সুযোগ পায়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

অর্থ: "আর ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯১)

ফিতনা-ফাসাদ সমাজে অনৈতিকতার জন্ম দেয়, নিন্দনীয় চরিত্র চর্চার প্রসার ঘটায়। ফিতনা-ফাসাদ সমাজের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে।

ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে ইসলামি বিধান

ফিতনা-ফাসাদ সম্পূর্ণরূপে ইসলামি আদর্শের বিরোধী। এটি হারাম বা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

অর্থ : "আর পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৫৬)

পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ তার অন্যায় ও মন্দকর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে নানা ধরনের ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। যারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে তারা খুবই জঘন্য চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা তাদের ঘৃণা করেন। তিনি বলেন,

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

অর্থ : "আর তুমি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করতে চাইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৭৭)

মানবজীবনে ফিতনা-ফাসাদের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা সদাসর্বদা এ থেকে বেঁচে থাকব। উত্তম গুণাবলির অনুসরণ ও সৎকর্মের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করব। যেকোনো প্রকার সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অরাজকতার বিরুদ্ধে সকলে মিলে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

কাজ : শিক্ষার্থী ফিতনা-ফাসাদের কুফলগুলো লিখে একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ২১

কর্মবিমুখতা

কর্মবিমুখতা বলতে কাজ না করার ইচ্ছাকে বোঝায়। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলা হয়। কোনো অক্ষম ব্যক্তি যদি কোনো কাজ করতে না পারে তবে তা কর্মবিমুখতা নয়। যেমন- অন্ধ, বধির বা প্রতিবন্ধীরা শারীরিক কারণে সবধরনের কাজ করতে সমর্থ নয়। বরং যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা অন্য কোনো কারণে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ না করে বেকার বসে থাকা হলো কর্মবিমুখতা।

কুফল

মানবজীবনে কাজের কোনো বিকল্প নেই। জীবনে বড় হওয়ার জন্য, জীবিকা উপার্জনের জন্য মানুষকে বহু কাজ করতে হয়। সময়মতো যথাযথভাবে এসব কাজ সম্পাদনের উপরই মানুষের উন্নতি ও সফলতা নির্ভর করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা জাতি কর্মবিমুখ সে ব্যক্তি বা জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য দুর্ভাগ্য, কলঙ্ক স্বরূপ।

২০২১

কর্মবিমুখতা মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে। এতে মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মানুষের কর্মস্পৃহা, কর্মক্ষমতা লোপ পায়। বলা হয় 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। অলস ব্যক্তিরা নানা অসৎ ও

অনৈতিক চিন্তা ও কর্মে ব্যাপৃত থাকে। অনেক সময় সন্ত্রাস সৃষ্টি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি অসৎ ও পাপকার্যে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয়।

কর্মবিমুখতার ফলে মানুষের মেধা, শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়। কর্মবিমুখ বেকারকে কেউ ভালোবাসে না। কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে চায় না। কর্মবিমুখতা মানুষের আত্মসম্মানবোধ লোপ করে। অন্যের অর্থে জীবনযাপন করার মানসিকতা তৈরি হয়। এতে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

কর্মবিমুখতা পরিহারের গুরুত্ব

ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। মানুষের অকল্যাণ হয় এমন কোনো বিধান বা আচার-আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। কর্মবিমুখতা মানবজীবনে অভিশাপ স্বরূপ। ইসলামে এর কোনো স্থান নেই। ইসলামে মানুষকে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইবাদত পালনের পরপরই কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

অর্থ : "অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর।" (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ১০)

হাদিসে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজকেও ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবি (স.) বলেছেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

অর্থ : "হালাল উপায়ে জীবিকা অন্বেষণ করা ফরজের পর আরও একটি ফরজ কাজ।" (বায়হাকি)

জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এজন্য বসে থাকলে চলবে না। বরং নিজ উদ্যোগে কাজ করার জন্য ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কোনোদিন খায়নি।" (বুখারি)

ইসলামে কর্মবিমুখতার কোনো সুযোগ নেই। বরং জীবিকা অর্জনের জন্য যেকোনো হালাল শ্রমকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। নবি-রাসুলগণের জীবনী পড়লে জানা যায় যে, তাঁরা জীবিকা উপার্জনের জন্য নানা কাজ করেছেন। হযরত আদম (আ.) কৃষি কাজ করতেন, হযরত দাউদ (আ.) কামারের কাজ করতেন, আমাদের নবি (স.) ব্যবসা করতেন। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা ছাগলও চরিয়েছেন। সুতরাং কোনো শ্রমই ছোট নয়। হযরত উমর (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহিত হয়ে বসে না থাকে। আমাদের অনেকে পড়ালেখা শেষ করে বেকার বসে থাকে। এরূপ বেকারত্ব ঠিক নয়। বরং যার যার সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করা দরকার। এতে শরীর মন ভালো থাকে। আল্লাহ তায়ালাও সন্তুষ্ট হন।

কাজ: একজন প্রকৃত মুমিন কিছুতেই কর্মবিমুখ হতে পারে না- কুরআন ও হাদিসের আলোকে এ উক্তির যথার্থতা নিরূপণ করবে।

পাঠ ২২

সুদ ও ঘুষ

সুদ

সুদ এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (اَلرِّبٰوا)। কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلرِّبٰوا) বা সুদ বলা হয়। ইসলাম পূর্বকালে আরব দেশে এটি একধরনের ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল। আরবসহ বিশ্বের অনেক সমাজে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। যার ফলে ধনী আরও ধনী হতো আর গরিব ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যেত। এটা ছিল শোষণের নামান্তর। তাই ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করে। অনেকে সুদ ও মুনাফা বা লভ্যাংশকে সমরূপ মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদুটো এক নয়। কেননা সুদে লোকসানের কোনো ঝুঁকি থাকে না। আর মুনাফা বা লভ্যাংশে ঝুঁকি থাকে। সুদের সংজ্ঞা দিয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

অর্থ : "যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তা-ই রিবা (সুদ)।" (জামি সগির)

ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একশত টাকা এ শর্তে ঋণ দিল যে গ্রহীতা একশত দশ টাকা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে একশত টাকার অতিরিক্ত দশ টাকা হলো সুদ। কেননা এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই।

শুধু টাকা পয়সা বা মাল সম্পদ বিনিময়েই সুদ সীমাবদ্ধ নয়। বরং একই শ্রেণিভুক্ত পণ্যদ্রব্যের লেনদেনে কম-বেশি করা হলেও তা সুদের আওতাভুক্ত হবে। যেমন- এক কেজি চালের বিনিময়ে দেড় কেজি চাল নেওয়া কিংবা এক কেজি চাল ও অতিরিক্ত অন্য কিছু নেওয়াও সুদ হবে। মহানবি (স.) স্পষ্ট করে বলেছেন, "সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে যব, আটার বিনিময়ে আটা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, এমনিভাবে সমজাতীয় দ্রব্যের নগদ আদান-প্রদানে অতিরিক্ত কিছু হলেই তা সুদ হবে।" (মুসলিম)

ঘুষ

ঘুষ অর্থ উৎকোচ। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের কাজের জন্য নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা পায়। কিন্তু তারা যদি ঐ কাজের জন্যই অন্যায়ভাবে আরও বেশি কিছু গ্রহণ করে তা হলো ঘুষ। যেমন কারও কোনো কাজ আটকে রেখে তার নিকট থেকে টাকা পয়সা আদায় করা। অন্য কথায় অধিকার নেই এরূপ বস্তু বা বিষয় লাভের জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে অন্যায়ভাবে কোনো সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কিংবা নেওয়াকে ঘুষ বলা হয়।

সমাজে নানাভাবে ঘুষের প্রচলন দেখা যায়। সাধারণত মানুষ অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য টাকা-পয়সা ঘুষ দিয়ে থাকে। এছাড়া উপহারের নামে নানা দ্রব্যসামগ্রী যেমন, টিভি, ফ্রিজ, গহনা, ফ্ল্যাট ইত্যাদিও ঘুষ

হিসেবে দেওয়া হয়। বস্তুত দ্রব্যসামগ্রী যে মূল্যমানেরই হোক, টাকা-পয়সা কম হোক বা বেশি হোক, ঘুষ হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা হারাম হবে।

কুফল ও পরিণতি

সুদ ও ঘুষ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে ওঠে। পারস্পরিক মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

ঘুষও মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব কর্তব্যে অবহেলা করে, আমানতের খিয়ানত করে। নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহার করে। ঘুষদাতা ও ঘুষখোর অন্য লোকের অধিকার হরণ করে। ফলে অধিকার বঞ্চিতদের সাথে তাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে মারামারি-হানাহানির সূত্রপাত ঘটে।

বস্তুত সুদ ও ঘুষের অপকারিতা অত্যন্ত মারাত্মক। এটি সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ডেকে আনে। সুদ ও ঘুষের প্রভাবে মানুষ নৈতিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। বরং অসৎ চরিত্র ও মন্দ অভ্যাসের চর্চা শুরু করে। মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, অপচয় ও পাপাচারের প্রসার ঘটে। অনেক সময় সুদ-ঘুষের অতিরিক্ত অর্থের জন্য মানুষ নানা রূপ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে সমাজে জিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তার অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। আর যে সমাজে ঘুষ লেনদেন প্রসার লাভ করে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়ে থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ)

আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সুদ ও ঘুষের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধর্মীয় দিক থেকেও এর কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ- ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। আর হারাম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যার শরীর হারাম খাদ্যে গঠিত, যার পোশাক পরিচ্ছদ হারাম টাকায় অর্জিত এরূপ ব্যক্তির কোনো ইবাদত কবুল হয় না, এমনকি তার কোনো দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারী যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত তেমনি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর নিকটও ঘৃণিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেন, লানত দেন। একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ

অর্থ : "নবি করিম (স.) সুদখোর, সুদ দাতা, সুদ চুক্তি লেখক ও সুদি লেনদেনের সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়েছেন।" (মুসলিম)

নবি করিম (স.) অন্যত্র বলেছেন, لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ

অর্থ : "ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত।"(বুখারি ও মুসলিম)

সুদ ও ঘুষ লেনদেন করার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। এর ফলে মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তায়ালা তাদের পাকড়াও করেন। মহানবি (স.) বলেন,

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبٰوا فِيْ قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

অর্থ : "কোনো গ্রামে বা দেশে যখন জিনা ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন সেখানকার অধিবাসীদের উপর আল্লাহর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে।" (মুসতাদরাকে হাকিম)

পরকালে সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীর স্থান হবে জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। সুদখোরদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদের মতোই।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫)

ঘুষখোরদের পরিণতি প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ

অর্থ : "ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামি।" (তাবারানি)

অন্য হাদিসে রাসুল (স.) ঘুষখোরদের অভিনব শাস্তির বিষয় বর্ণনা করেছেন। হাদিস শরিফে এসেছে, আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবি করিম (স.) যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। তার ডাকনাম ছিল ইবনুল লুতবিয়া। সে (যাকাত আদায় করে) ফিরে এসে মহানবি (স.)-কে বলল, এই মাল আপনাদের আর এই মাল আমাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) মিম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ প্রকাশ করার পর বলেন- যেসব পদের অভিভাবক আল্লাহ্ আমাকে করেছেন, তার মধ্য থেকে কোনো পদে আমি তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করি। সে আমার কাছে ফিরে এসে বলে, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। এ ব্যক্তি তার বাবা-মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন? যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সেখানেই তো তার উপঢৌকন পৌঁছে দেওয়া হবে। আল্লাহর শপথ। তোমাদের কোনো ব্যক্তি অনধিকারে (বা অবৈধভাবে) কোনো কিছু গ্রহণ করলে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করতে করতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। অতএব আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহর দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হতে দেখতে চাই না যে, সে উট বহন করবে আর তা আওয়াজ করতে থাকবে অথবা গাভী (বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে অথবা বকরি (বোঝা বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত এত উপরে উঠালেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার হুকুম) পৌঁছে দিয়েছি? তিনবার তিনি এ কথা বলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ইসলামের আলোকে সুদ-ঘুষের বিধান

ইসলামে সুদ ও ঘুষকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো অবৈধ, কোনো অবস্থাতেই সুদ-ঘুষের লেনদেন বৈধ নয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ

অর্থ : "আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫)

অন্য আয়াতে এসেছে, "হে ইমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, "হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সুদের যা বকেয়া আছে তা ত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৮)

ঘুষের আদান প্রদানও হারাম বা অবৈধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে জেনেশুনে বিচারকদের নিকট পেশ করো না।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৮)

সুদ ও ঘুষ সর্বাবস্থায় হারাম। এগুলো গ্রহণ করা যেমন হারাম তেমনি দেওয়াও হারাম। তেমনিভাবে সুদ দেওয়া ও সুদ নেওয়া উভয়টিই সমান অপরাধ। এমনকি সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাও অপরাধ। রাসুল (স.) সুদি কারবারে বা সুদি লেনদেনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। বস্তুত সুদ ও ঘুষ খুবই জঘন্য অপরাধ। রাসুলুল্লাহ (স.) বহু হাদিসে মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন।

সুদ ও ঘুষের লেনদেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ কাজ কখনোই করতে পারে না। আমরাও জীবনের সর্বাবস্থায় সুদ ও ঘুষের লেনদেন থেকে বিরত থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সুদ ও ঘুষের কুফল ও পরিণতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমানতের খিয়ানত করা কার চিহ্ন–

ক. ফাসিকের খ. কাফিরের
গ. মুনাফিকের ঘ. মিথ্যাবাদীর।

২। যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়- বাণীটি কার?

ক. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) খ. হযরত আবু বকর (রা.)
গ. হযরত উমর (রা.) ঘ. হযরত আলি (রা.)

৩। স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করতে হয়-

i. নিজের কাজের মাধ্যমে
ii. শুধু মুখের কথা দিয়ে
iii. আর্ত-মানবতার সেবা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রফিক সাহেব ও শফিক সাহেব একই অফিসে চাকরি করেন। রফিক সাহেব সব সময় নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চান। তিনি প্রায়ই শফিক সাহেবের আত্মসম্মানে আঘাত করে কথা বলেন। কিন্তু শফিক সাহেব কলহে জড়ান না।

৪। রফিক সাহেবের আচরণে কিসের অভাব পরিলক্ষিত হয়?

ক. ভ্রাতৃত্ববোধের খ. সম্প্রীতির
গ. সম্মানবোধের ঘ. আমানতের

৫। শফিক সাহেবের আচরণের ফলে-তিনি

i. আল্লাহর নির্দেশ মান্যকারী হবেন।
ii. রাসুলুল্লাহ (স.) এর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন।
iii. অফিসে ধৈর্যশীল হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব কবির সরকারি চাকরি করেন। তিনি তার কর্মস্থলে জনসাধারণের কাজ করে দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে খুব আয়েশি জীবনযাপন করেন। তার ছেলে জনাব খবির বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে কর্মহীন জীবনযাপন করছেন। কেউ তাকে চাকরি খোঁজা বা কোনো কর্মে নিযুক্ত হওয়ার কথা বললে তিনি বলেন, কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। তাই তার বাবা বড়ই উদ্বিগ্ন।

ক. আখলাকে যামিমাহ অর্থ কী?
খ. দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কেন?
গ. জনাব খবিরের কাজের মাধ্যমে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জনাব কবিরের কাজের পরিণতি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. রাশেদ তার বন্ধু শাহেদের কাছে স্কুলের বেতন ও সেশন চার্জের তিন হাজার টাকা রেখে বলল আগামীকাল তোমার থেকে ফেরত নিয়ে ব্যাংকে জমা দেব। পরদিন টাকা ফেরত চাইলে রাশেদ বলল ঐ দিনই তোমাকে টাকা ফেরত দিয়েছি। রাশেদ শাহেদের এ কথায় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়। এ ঘটনা রাশেদের অনুপস্থিতিতে সে অপর বন্ধুদেরকে জানায়।

ক. আমানত কী?
খ. মানব সেবাকারীকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণটি ব্যাখ্যা কর।
গ. শাহেদের কাজের মাধ্যমে কী প্রকাশ পেয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রাশেদের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

আদর্শকে আরবিতে 'উছওয়া' (أُسْوَةٌ) বলে। আদর্শ বলতে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য চালচলন এবং রীতিনীতিকে বোঝায়। মানুষের সামগ্রিক জীবন সুন্দর ও সফল করতে মনীষীদের যেসব জীবনকর্ম অনুসরণ করা হয় তা-ই হলো জীবনাদর্শ। শেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১)

হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর দেখানো পথ অনুসরণ করে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন এবং তাঁদের জীবনাদর্শ দ্বারা মানবজাতিকে সঠিক পথে চলতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলোই হলো আমাদের জন্য আদর্শ।

আদর্শ জীবনচরিতের বৈশিষ্ট্য : আদর্শ জীবনচরিতে দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। যেমন, (ক) গ্রহণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং (খ) বর্জনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

গ্রহণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : (ক) মানুষের মাঝে সততা, বিশ্বস্ততা, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার সমন্বয় থাকা, (খ) আত্মসংযম, পরোপকারিতা, বদান্যতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, বিনয় ও নম্রতা থাকা এবং (গ) সুশৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্প্রীতি, নিরপেক্ষতা, ক্ষমা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি গুণের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা।

বর্জনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- (ক) মানুষের মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, জিঘাংসা ও গোঁড়ামি থাকা; (খ) আড়ম্বরতা, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, পরনিন্দা ও অসত্য থাকা এবং (গ) অসহনশীলতা, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা, অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচার ও বেহায়াপনাসহ অশোভন সকল খারাপ আচরণে লিপ্ত থাকা।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আদর্শ জীবনচরিতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর কিশোর বয়সের সততা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অনন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর যৌবনকালের সুউচ্চ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর মাদানি জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর মদিনা সনদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর বিদায় হজের ভাষণ ও ভাষণে প্রতিফলিত মানবাধিকার ও সাম্যের ধারণা, নারীর প্রতি সম্মানবোধ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর মক্কা বিজয় ও ক্ষমার আদর্শ বর্ণনা করতে পারব;
- খুলাফায়ে রাশেদিনের পরিচয় ও জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব;

- খুলাফায়ে রাশেদিনের চরিত্রে প্রস্ফুটিত গুণাবলি : মানবসেবা, দানশীলতা, উদারতা, জ্ঞানচর্চা, প্রজাবাৎসল্য, ন্যায়বিচার ও সুশাসন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মুসলিম মনীষীগণের চরিত্রে প্রস্ফুটিত গুণাবলি : সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক চেতনা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য, বিশ্বস্ততা, ত্যাগ ও ক্ষমা, দেশপ্রেম, পরোপকারিতা ও শিক্ষাবিস্তারে অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষত চিকিৎসা, রসায়ন, ভূগোল ও গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুলগণের মধ্যে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মানুষ চরম বর্বরতা ও অজ্ঞতার মাঝে ডুবে ছিল। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরমভাবে অধঃপতিত। তারা অসংখ্য মূর্তি তৈরি করত এবং মূর্তির পূজা করত। গোত্রের ভিন্নতার পাশাপাশি তাদের মূর্তিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তারা পবিত্র কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। কালের এই চরম অবক্ষয়ের কারণে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তাঁর নিকট মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। মহানবি (স.) মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন।

সামাজিক অবস্থা

মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুল এর শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের আচার ব্যবহার ও চালচলন ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। তাই সে যুগকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়্যা' বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জান, মাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদ্যপান, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। নারীদের সামাজিক জীব মনে করা হতো না; বরং দাসী হিসেবে তাদের বিক্রি করা হতো, ভোগ বিলাসের বস্তু মনে করা হতো। যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের (ভূমিষ্ঠ হওয়ার) সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা খুবই নিকৃষ্ট।" (সূরা আন্-নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯)

এক কথায় অপরাধের এমন কোনো দিক ছিল না যা তারা করত না।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

জাহিলি যুগে আরবের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত থাকলেও সাহিত্যের প্রতি তাদের খুব অনুরাগ ছিল। তাদের অনেকেই মুখে মুখে গীতিকবিতা চর্চা করত। তৎকালীন আরবে উকায মেলা নামে বাৎসরিক একটি মেলা বসত। মেলায় তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করত। যেসব কবিতা সেরা বিবেচিত হতো তা সোনালি বর্ণে লিখে পবিত্র কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'আস-সাবউল মুআল্লাকাত' (সাতটি ঝুলন্ত গীতিকবিতা) জাহিলি যুগেই রচিত। কবিতা রচনার কারণে আরবরা জাহিলি যুগেই বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাদের কবিতা মানের দিক থেকে ছিল খুব উন্নত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "যখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের কোনো কিছু বুঝতে না পার, তবে তার অর্থ আরবদের কবিতায় তালাশ কর। কারণ কবিতা তাদের জীবনালেখ্য।" (আল-মুফাচ্ছাল)

এতে বোঝা যায় প্রাচীন আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন, নানা কিংবদন্তি ও মুখরোচক কাহিনী এবং বাগ্মিতার প্রচলন ছিল, তবে তাদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা।

পাঠ ২

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর

জন্ম ও শৈশব

আরব যখন চরম জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত তখন আরবের কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্। দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব। মাতার নাম আমিনা। নানার নাম ওয়াহাব। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। আর তাঁর মাতা নাম রাখেন আহমাদ।

জন্মের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ধাত্রী মা হালিমার ঘরে লালিত-পালিত হন। হালিমা বনু সাদ গোত্রের লোক ছিলেন। আর বনু সাদ গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলত। ফলে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)ও বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতেন। শৈশবকাল থেকে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের নজির দেখা যায়। তিনি ধাত্রী হালিমার একটি স্তন পান করতেন অন্যটি তাঁর দুধভাই আব্দুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন।

হালিমা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে পাঁচ বছর লালন-পালন করে তাঁর মা আমিনার নিকট রেখে যান। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন। প্রিয়নবি (স.) অসহায় হয়ে পড়লে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। আর আট বছর বয়সে তাঁর দাদাও মারা যান। এরপর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব।

কৈশোর

চাচা আবু তালিব অত্যন্ত আদর স্নেহ দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে লালন-পালন করতে থাকেন। আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল। হযরত মুহাম্মদ (স.) এ অবস্থা অবলোকন করে চাচার সহযোগিতায় কাজ করা শুরু করেন। তিনি মেষ চরাতেন। মেষপালক রাখাল বালকদের জন্য তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শ। তাদের সাথে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। কখনোই তাদের সাথে কলহ বা ঝগড়া-বিবাদ করতেন না। তিনি ১২ বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাচার সঙ্গে সিরিয়া যান। যাত্রাপথে 'বুহায়রা' নামক এক পাদ্রির সাথে দেখা হলে বুহায়রা মুহাম্মদকে অসাধারণ বালক বলে উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, 'এ বালকই হবে আখেরি নবি (শেষ নবি)।'

শৈশবকাল থেকেই মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী। সিরিয়া থেকে ফিরে এসে তিনি ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা দেখলেন। যুদ্ধটি শুরু হলো নিষিদ্ধ মাসে। তাছাড়া কায়স গোত্র অন্যায়ভাবে কুরাইশদের উপর এ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। এ জন্য একে 'হারবুল ফিজার' বা অন্যায় যুদ্ধ বলা হয়। পাঁচ বছর যাবৎ এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ যুদ্ধে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়। তাতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠে। আহতদের আর্তনাদ শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এ অশান্তি তাঁর সহ্য হলো না। তাই তিনি আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' (শান্তি সংঘ) গঠন করলেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শান্তিসংঘ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঐ হিলফুল ফুযুলের কাছে অনেকাংশে ঋণী। তারাও হিলফুল ফুযুলের মতো যুদ্ধ বন্ধ করে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি- আমানতদারি, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার কারণে তৎকালীন আরবের লোকজন তাঁকে আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর যারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল তারাও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি।

পাঠ ৩

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যৌবনকাল, নবুয়ত প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার

যৌবনকাল

যুবক মুহাম্মদ (স.)-এর সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও চারিত্রিক গুণাবলির সংবাদ মক্কার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখনকার আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী বিদুষী ও বিধবা মহিলা হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসার দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অর্পণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া যান। তিনি এ ব্যবসায় আশাতীত লাভবান হয়ে দেশে ফিরে আসেন। যৌবনকালে খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায় হযরত মুহাম্মদ (স.) যে দায়িত্বশীলতা ও সততার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সর্বকালে সকল ব্যবসায়ী যুবকের

জন্য আদর্শ। খাদিজা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী 'মাইসারা'কে মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে সিরিয়া পাঠান। মাইসারা সিরিয়া থেকে ফিরে এসে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলির বর্ণনা খাদিজা (রা.)-কে দেন। তাতে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা নিজেই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট তাঁর বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। চাচা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) খাদিজাকে বিবাহ করেন। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আর খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। বিবাহের পর খাদিজার আন্তরিকতায় ও সৌজন্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রচুর সম্পদের মালিক হন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.) এ সম্পদ নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করে অসহায়, দুঃখী, পীড়িত ও গরিব-মিসকিনদের সেবায় ব্যয় করেন।

আজকের সমাজে আমরা যদি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ন্যায় আর্তমানবতার সেবায় সম্পদ ব্যয় করি, তাহলে সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও গরিব-দুঃখীদের কষ্ট লাঘব হবে, সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন কাবা শরিফ পুনর্নির্মাণ করা হয়। হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন নিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রে বিরোধ দেখা দেয়। সবাই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে চায়। তাতে কেউ ছাড় দিতে রাজি নয়। ফলে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর সকলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পরের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কাবা ঘরে প্রবেশ করবে তার ফয়সালা মেনে নেওয়া হবে। দেখা গেল পরের দিন সকলের আগে হযরত মুহাম্মদ (স.) কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, এই এসেছেন আল-আমিন, আমরা তাঁর প্রতি আস্থাশীল ও সন্তুষ্ট। হযরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে যে ফয়সালা দিলেন, সকলে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিল। ফলে তারা অনিবার্য রক্তপাত থেকে মুক্তি পেল। এভাবে বর্তমান সময়েও বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করলে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতি অনেক অনিবার্য দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও রক্তপাত থেকে মুক্তি পাবে।

নবুয়ত প্রাপ্তি

হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। দীর্ঘদিন ধ্যানে মগ্ন থাকার পর ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রমযান মাসের কদরের রাতে হযরত জিবরাইল (আ.) তাঁর নিকট ওহি নিয়ে আসেন এবং তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। জিবরাইল (আ.) বললেন,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ

অর্থ: "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আলাক, আয়াত ১)।

উত্তরে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরাইল (আ.) তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। এভাবে তিনবার প্রিয়নবি (স.)-কে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর তৃতীয়বারের সময় তিনি পড়তে সক্ষম হলেন। বাড়ি ফিরে হযরত মুহাম্মদ (স.) হযরত খাদিজা (রা.)-এর নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন এবং জীবনের আশংকা করলেন। তখন হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- না, কখনো না। আল্লাহর শপথ! তিনি আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুঃস্থ ও দুর্বলদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, নিঃস্ব ও অভাবীদের

উপার্জনক্ষম করেন। মেহমানদের সেবাযত্ন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে (লোকদের) সাহায্য করেন।

এতে বোঝা যায় যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও হযরত মুহাম্মদ (স.) কী রকম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে মানবিক মহৎ গুণাবলি অনুশীলন করতেন এবং মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। আমাদের উচিত বাস্তবজীবনে মহানবির এসব আদর্শ অনুশীলন করা।

ইসলাম প্রচার

নবুয়ত প্রাপ্তির পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বিপথগামী মক্কাবাসীর নিকট ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, আল-কুরআন এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ামক এবং সবকিছুর মালিক। তিনি সকল সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যুদানকারী।

প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। পরে আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলামের পথে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। এতে মূর্তি পূজারিরা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করল। নবিকে তারা ধর্মদ্রোহী, পাগল বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা তাঁর উপর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন চালাল, পাথর ছুড়ে আঘাত করল, আবর্জনা নিক্ষেপ করল, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে নেতৃত্ব, ধন-সম্পদ ও সুন্দরী নারীর লোভ দেখাল। তিনি বললেন, আমার এক হাতে চন্দ্র আর অন্য হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার করা থেকে বিরত হব না। সত্য প্রচারে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) যে আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরও সত্য ও ন্যায়ের পথে আত্মত্যাগী, দৃঢ়সংযমী, ধৈর্যশীল ও কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া উচিত।

পাঠ ৪

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাদানি জীবন

মক্কার কাফিররা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে না পেরে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করলেন। মক্কার তুলনায় মদিনায় শান্ত ও নির্মল পরিবেশে এসে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) গুরুত্বপূর্ণ অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে চলমান দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ বন্ধ করলেন। মুহাজির (ইসলামের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী) ও আনসারদের (মুহাজিরদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্যকারী মদিনাবাসী) মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সৌহার্দ্য স্থাপন করলেন। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো। গড়ে তুললেন ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা। সকল মুসলিমের মিলনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুললেন মসজিদে নববি।

মদিনা সনদ

মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকজনের আবাস। হযরত মুহাম্মদ (স.) এই সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত। এই সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল। তার মধ্যে প্রধান ধারাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমানভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

২. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান এবং সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কর্তা।

৩. মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।

৪. কেউ কুরাইশ বা অন্য কোনো বহিঃশত্রুর সাথে মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

৫. স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় তা প্রতিহত করা হবে।

৬. বহিঃশত্রু কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হলে সকলে সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করবে এবং প্রত্যেকে স্ব-স্ব গোত্রের যুদ্ধতার বহন করবে।

৭. কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হবে। তার অপরাধের জন্য গোটা সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

৮. মদিনা পবিত্র নগরী বলে ঘোষণা করা হলো। এখন থেকে এই শহরে রক্তপাত, হত্যা, ব্যভিচার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।

৯. ইহুদি সম্প্রদায়ের মিত্ররাও সমান স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।

১০. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুমতি ব্যতীত মদিনার কোনো গোত্র কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

১১. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কখনো বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা মীমাংসা করবেন।

১২. সনদের ধারা ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে।

এই মদিনা সনদ হলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান, যার মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবি (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।

আমাদের উচিত রাষ্ট্রের কল্যাণে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে সুন্দর সমৃদ্ধ গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা।

পাঠ ৫

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ

মক্কা বিজয়

অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় মদিনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার খুব দ্রুত ঘটতে লাগল। ষষ্ঠ হিজরিতে মক্কার কুরাইশরা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও মুসলমানদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করে। কুরাইশরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলে রাসুল (স.) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ১০০০০ (দশ হাজার) মুসলিম নিয়ে মক্কা অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। মক্কার অদূরে হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁবু স্থাপন করেন। কুরাইশরা মুসলিমদের এই বাহিনী দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হলো। তারা কোনো প্রকার বাধা দেওয়ার সাহস করল না। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। বললেন-

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

অর্থ : "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।"

সে সময়ে তিনি ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ানসহ সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও যেভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন মানবতার ইতিহাসে তা বিরল। ভুল বুঝতে পারার পর আমাদের শত্রুরা অনুতপ্ত হলে আমরাও তাদের বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেব। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ।

বিদায় হজ ও এর ভাষণ

মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। আরবের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলাম পৌঁছে গেল। হযরত মুহাম্মদ (স.) বুঝলেন আর বেশিদিন পৃথিবীতে তাঁর থাকা হবে না। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে (দশম হিজরিতে) হজ করার ইচ্ছা করলেন। এ উদ্দেশ্যে উক্ত সালের যিলকদ মাসে লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে হজ করতে গেলেন, যা বিদায় হজ নামে পরিচিত। এ হজে রাসুল (স.)-এর সহধর্মিণীগণও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যুল হুলাইফা নামক স্থানে এসে সকলে ইহরাম (হজের পোশাক) বেঁধে বাইতুল্লাহর উদ্দেশে রওনা হন। জিলহজ মাসের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এক যুগান্তকারী ভাষণ দেন। এ ভাষণে বিশ্ব মানবতার সকল কিছুর দিকনির্দেশনা ছিল। আরাফাতের ময়দানের পার্শ্বে 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ে উঠে মহানবি (স.) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন-

১. হে মানব সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কারণ আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কিনা জানি না।

২. আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনই তোমাদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট পবিত্র।

৩. মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন সকলকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে।

৪. হে বিশ্বাসীগণ! স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।

৫. সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে ও সুদ খাবে না।

৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করবে না।

৭. মনে রেখ! দেশ, বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ থেকে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হলো। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহভীতি ও সৎকর্ম। সে ব্যক্তিই সবচাইতে সেরা, যে নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

৮. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না; পূর্বের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। নিজ যোগ্যতা বলে ক্রীতদাস যদি নেতা হয় তার অবাধ্য হবে না। বরং তার আনুগত্য করবে।

৯. দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

১০. জাহিলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী এবং তাঁর রাসুলের আদর্শ রেখে যাচ্ছি। এগুলো যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।

১১. আমিই শেষ নবি। আমার পর কোনো নবি আসবে না।

১২. তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেবে।

তারপর হযরত মুহাম্মদ (স.) আকাশের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি? সাথে সাথে উপস্থিত জনসমুদ্র থেকে আওয়াজ এলো, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই পেরেছেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এরপরই আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের দ্বীন (জীবনবিধান)-কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সুরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

মহানবি (স.) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। উপস্থিত জনতাও নীরব থাকল। অতঃপর সকলের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আল-বিদা' (বিদায়)। একটা অজানা বিয়োগ-ব্যথা উপস্থিত সকলের

অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তুলল।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর ভাষণের মাধ্যমে যে দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছিলেন বাস্তব জীবনে তিনি তা অনুশীলন করেছেন। আমরাও আমাদের ভাষণে বা বক্তব্যে যা বলব বাস্তব জীবনে তা অনুশীলন করব। তাহলে আমাদের দেশ ও জাতি আরও সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত হবে।

> কাজ : 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে' ক্লাসে বসে শিক্ষার্থীরা এর উপর দশটি বাক্য তৈরি করবে।

খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনাদর্শ

খুলাফায়ে রাশেদিন অর্থ 'সঠিক পথ নির্দেশপ্রাপ্ত খলিফা'। এর দ্বারা ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে বোঝায়। তাঁরা হলেন- হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলি (রা.)। তাঁরা সকলেই মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) থেকে সরাসরি ইসলামের শিক্ষা লাভ করেছেন। বাস্তব জীবনে তা যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। তাই তাঁদের জীবনকর্ম আমাদের আদর্শ।

পাঠ ৬
হযরত আবু বকর (রা.)

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ এবং তাঁর উপাধি সিদ্দিক ও আতিক। ছোটকাল থেকেই মহানবি (স.)-এর সাথে তাঁর ছিল গভীর বন্ধুত্ব। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম কবুল করেন। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সর্বদা তিনি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে থাকতেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এরূপ সর্বস্ব ব্যয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর মুখে মি'রাজের ঘটনা শোনামাত্র নিঃসন্দেহে তা বিশ্বাস করেন। তাই তাঁকে সিদ্দিক (মহাসত্যবাদী) উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর খলিফা নির্বাচন, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ওফাতের পর দাফন ও রাসুলের উত্তরাধিকারীর বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সমাধা হয়। ফলে মুসলমানগণ এক অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পান। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি জনতার উদ্দেশে বললেন, "যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর অনুসরণ করি ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে। তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের হক আদায় না করা পর্যন্ত তারা আমার নিকট শক্তিশালী। আর যারা সবল তাদের নিকট থেকে পাওনাদারের হক আদায় না করা পর্যন্ত তারা আমার নিকট দুর্বল।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর শাসন সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে, কতিপয় লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, আবার কতিপয় লোক ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবিলা করেন, ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। আমাদেরও উচিত হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতো অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করে দেশ ও জাতিকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করা।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার কারণে তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরও হযরত আবু বকর (রা.) ব্যবসা করতেন। নিজ হাতের উপার্জন খেতেন। পরবর্তীতে মুসলমানদের দাবির মুখে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সামান্যমাত্র ভাতা নিতেন। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও হযরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, তা সকল রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্র-প্রধানের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করবে।

পাঠ ৭

হযরত উমর (রা.)

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব। মাতার নাম হানতামা। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী। যুবক বয়সে নামকরা কুস্তিগির, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর ফারুক (রা.) প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। একদা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যার জন্য তিনি খোলা তরবারি হাতে নিয়ে বের হলেন। পথে শুনলেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের হত্যা করার জন্য তাঁদের বাড়ি যান। তাঁদের উপর অনেক অত্যাচার চালান। তাঁদের ইসলাম ত্যাগ করতে বলেন, কিন্তু তাঁরা প্রাণের বিনিময়েও ইসলাম ত্যাগ করতে চাইলেন না। তাঁদের অনড় অবস্থা দেখে তাঁর ভাবান্তর ঘটল। তিনি তাঁদের মাধ্যমে কুরআন মজিদের সুরা ত্বহার কিছু আয়াত শ্রবণ করেন। কুরআনের বাণী তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি ঈমান আনার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দরবারে গিয়ে নিজের তরবারিটি মহানবি (স.)-এর পায়ের কাছে রেখে মুসলমান হয়ে গেলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) মহানবিকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি যে দাওয়াত দিচ্ছেন

তা কি সত্য? মহানবি (স.) বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন- তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবাঘরের সামনে সালাত আদায় করব। মহানবি অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দিলেন। তিনি নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ৩৩ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.) ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেন। তাবুক অভিযানে হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ন্যায় সাহসী হয়ে আমরাও সত্য পথে চলব ও সত্য কথা বলব।

ন্যায় বিচারক

হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক। আইনের চোখে তিনি ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, আপন-পরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। মদ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শাহমাকে তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) ছিলেন উদারমনা। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন।

চরিত্র

হযরত উমর ফারুক (রা.) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর মানবীয় গুণটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তিনি সত্য ও অসত্যের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর খোঁজ-খবর রাখার জন্য পুলিশ বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রতি চার মাস পর বাধ্যতামূলক ছুটির ব্যবস্থা করেন। কৃষি কাজের উন্নয়নে খাল খননের ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা নিয়ে তিনি তাঁবুতে দিয়ে আসেন। স্বীয় স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে, প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইনের স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য তার ঘরে নিয়ে যান। পৃথিবীর রাজা বাদশাহদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন প্রজাবৎসল শাসক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানব দরদি হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন সাম্য জবাবদিহিতা ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। একদা এক লোক স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, বাইতুলমাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে কারও পুরো একটি জামা হয়নি। অথচ খলিফার গায়ে সে কাপড়ের একটি পুরো জামা দেখা যাচ্ছে। খলিফা অতিরিক্ত কাপড় কোথায় পেলেন? খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.) উত্তর দিলেন যে, আমি আমার অংশটুকু আমার আব্বাকে দিয়ে দিয়েছি, এতে তাঁর পুরো জামা হয়েছে।

আমাদের দেশেও যদি শাসনকার্যে জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায় তাহলে আমাদের শাসনকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণও হযরত উমরের মতো ন্যায়পরায়ণ হবেন।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতায় হযরত উমরের অবস্থানের উপর দশটি বাক্য তৈরি করবে।

পাঠ ৮

হযরত উসমান (রা.)

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তিনি ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও লজ্জাশীল ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায়ও ছিলেন স্বনামধন্য। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর দু'কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে (একজনের মৃত্যুর পর আরেকজনকে) তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তাঁকে যুননুরাইন (দুই জ্যোতির অধিকারী) বলা হয়।

তিনি ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে নানা রকম নির্যাতন করে। সব নির্যাতন তিনি সহ্য করেন। আত্মীয়দের নির্যাতন অসহ্য পর্যায়ে পৌঁছালে তিনি মহানবি (স.)-এর কন্যা ও স্বীয় সহধর্মিণী রুকাইয়াকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

ইসলামের খেদমত

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসা করে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেন। যার কারণে তাঁকে গনি (ধনী) বলা হতো। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তাঁর সম্পদ ব্যয় করেন। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি ১৮০০০ (আঠার হাজার) দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ্ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তাবুক যুদ্ধের ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) সৈন্যের এক তৃতীয়াংশ তথা দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেন। রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করতে তিনি একাই এক হাজার উট দান করেন। এ ছাড়াও তিনি সাতটি ঘোড়া ও এক হাজার দিনার মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দরবারে দান করেন।

হযরত উসমান (রা.)-কে আল্লাহ্ যেমন প্রচুর সম্পদ দান করেছেন তেমনি তিনি তা অকাতরে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সর্বকালের সম্পদশালী লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

কুরআন সংকলন

আরবের বিভিন্ন এলাকার লোকজন বিভিন্ন উপভাষায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করত। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের আরও বিস্তৃতি ঘটে। এতে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। হযরত উসমান (রা.) এ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনিন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপি সংগ্রহ করেন। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), হযরত সাঈদ ইবনে আল-আস (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে

হিশাম (রা.)। হিজরি ৩০ মোতাবেক ৬৫১ খ্রি. তাঁরা হযরত হাফসা (রা.) থেকে সংগৃহীত কপির আলোকে আরও ৭টি কপি তৈরি করেন এবং তা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। একে 'মাসহাফে উসমানি' বলা হয়। ফলে সারাবিশ্বে একটি রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ হয়। এজন্য তাঁকে 'জামিউল কুরআন' (কুরআন একত্রকারী বা কুরআন সংকলক) বলা হয়। বিশ্বে বর্তমানে প্রচলিত কপিগুলোও মাসহাফে উসমানির প্রতিলিপি।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরআন সংকলনে হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের উপর একটি টীকা তৈরি করবে।

পাঠ ৯

হযরত আলি (রা.)

হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু তোরাব ও আবুল হাসান। বাল্যকাল থেকেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে থাকতেন। মহানবি (স.)-এর প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তাই দশ বছর বয়সেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বালকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হিজরত করে মদিনা যাওয়ার সময় হযরত আলি (রা.)-কে আমানতের মালের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর বিছানায় রেখে যান। জীবনের কঠিন ঝুঁকি সত্ত্বেও তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। মহানবি (স.)-এর দেওয়া দায়িত্বের চেয়ে তিনি তাঁর জীবনের মূল্য তুচ্ছ মনে করেছেন। দায়িত্ব পালনই ছিল তাঁর কাছে বড় ব্যাপার। হযরত আলি (রা.)-এর মতো সত্যের পথে জীবনবাজি রাখা যুবক খুব কম আছে। আমরাও সত্যের পথে একনিষ্ঠ থাকব এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করব।

বীরত্ব

হযরত আলি (রা.) ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য রাসুল (স.) তাঁকে 'যুলফিকার' তরবারি উপহার দেন। খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করলে হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধি প্রদান করেন। হুদায়বিয়া সন্ধিপত্র তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা তাঁর হাতে ছিল।

জ্ঞান সাধনা

হযরত আলি (রা.) অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞান তাপস ও জ্ঞান সাধক। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণে তিনি তাঁর যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কথিত আছে যে, 'হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন জ্ঞানের শহর, আর আলি হলেন তার দরজা'। তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলি' নামক কাব্য গ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আমরাও সর্বদা হযরত আলি (রা.)-এর মতো জ্ঞান সাধনা করব।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত আলি (রা.) সারা জীবন জ্ঞান সাধনায় ব্যস্ত থাকায় সম্পদ উপার্জন করার সময় পাননি। তিনি অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কখনো না খেয়ে থাকতেন। তবুও আক্ষেপ করতেন না। বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তাঁর স্ত্রী রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করতেন ও রুটি তৈরি করতেন। মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়ার পরও তিনি বাসায় কোনো কাজের লোক রাখেননি।

ইসলামের সেবা

তিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হওয়ায় ধন-সম্পদ দিয়ে ইসলামের উল্লেখযোগ্য সেবা করতে পারেননি। তবে তাঁর শৌর্য-বীর্য, সাহসিকতা ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইসলামের অনেক সেবা করেছেন। সাহসিকতা, বীরত্ব, জ্ঞানচর্চা, আত্মসংযম ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে হযরত আলি (রা.) আমাদের সকলের আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত আলি (রা.)-এর জ্ঞান সাধনার উপর একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

মুসলিম মনীষী

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট ওহির সূচনা হলো اِقْرَأْ 'ইকরা' (আপনি পড়ুন) শব্দ দিয়ে। এজন্য ইসলাম শিক্ষায় প্রশিক্ষণ, জ্ঞান ও জ্ঞানীদের অনেক মর্যাদার কথা রয়েছে। আল কুরআনকে বলা হয়েছে হাকিম (বিজ্ঞানময়)। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কায় দারুল আরকাম নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববির বারান্দায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে 'সুফফা' নামে একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। মক্কা বিজয়ের পর মসজিদে নববি জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে সুদূর পারস্য, রোম, কুফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া ও মিসর থেকে শিক্ষার্থীরা এসে জ্ঞানের জন্য ভিড় জমাত।

জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য মহানবি (স.) তাঁর সাহাবিদের বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে আরও মহিমান্বিত করে তোলেন। জ্ঞানের প্রদীপ বিভিন্ন দেশে প্রজ্বলিত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন অসংখ্য শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার। আব্বাসি খলিফা মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাইতুল হিকমার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হয়। শাসকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে ইতিহাস, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীগণ বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। ফলে মুসলিমগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের কথা মানব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। মুসলমানগণ হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রেও অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। হাদিস শাস্ত্রে ইমাম বুখারি (র.), ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.), দর্শনশাস্ত্রে ইমাম গাযালি (র.) ও তাফসির শাস্ত্রে ইমাম ইবনে জারির আত তাবারির (র.) অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

পাঠ ১০
ইমাম বুখারি (র.)

ইমাম বুখারি (র.)-এর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, পিতার নাম ইসমাইল, দাদার নাম ইবরাহিম। উপাধি 'আমিরুল মু'মিনুন ফিল হাদিস বা হাদিস বর্ণনায় মুমিনদের নেতা'। তিনি ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র বুখারা নগরীতে ১৯৪ হিজরি ১৩ শাওয়াল, ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মায়ের স্নেহ ও ভালোবাসায় তিনি বড় হন।

জ্ঞানার্জন

বাল্যকাল থেকে জ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। তিনি খুব তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ফলে ছয় বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন হিফজ (মুখস্থ) করে ফেলেন। দশ বছর বয়স থেকেই হাদিস মুখস্থ করা আরম্ভ করেন। ষোল বছর বয়সেই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আল্লামা ওয়াকি-এর লেখা হাদিস গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মা ও ভাইসহ হজ করতে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। সেখানে তিনি হিজাযের মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিস শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। একাধারে ছয় বছর হাদিস বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর তিনি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য কূফা, বাগদাদ, বসরা, মিসর, সিরিয়া, আসকালান, হিমস, দামিশক ইত্যাদি স্থানে গমন করেন। তিনি লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বিধায় কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে গমনাগমন করতেন না।

বুখারি শরিফ সংকলন

ইমাম বুখারি দীর্ঘ ষোল বছর সাধনা করে ৬ লক্ষ হাদিস থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৭২৭৫টি হাদিস বুখারি শরিফে লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যেক হাদিস লিখার পূর্বে তিনি ওযু ও গোসল করে দুই রাকআত নফল নামায পড়তেন। অতঃপর ইস্তেখারা (স্বপ্নে আল্লাহর নিকট থেকে নির্দেশনা পাওয়ার আবেদন) করতেন। বিশুদ্ধ মনে হলে সেই হাদিস লিখতেন। হাদিসবিশারদ ও উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পৃথিবীতে আল-কুরআনের পর বুখারি শরিফই হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এটি ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জ্ঞান সাধনায় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করলে যে স্মরণীয় ও বরণীয় হওয়া যায় ইমাম বুখারি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বুখারা ত্যাগ

ইমাম বুখারি দীর্ঘ সাধনা শেষে বুখারায় এলে তৎকালীন বাদশাহ খালিদ ইবনে আহমদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বাদশাহ ইমাম বুখারির ইলমে হাদিসের গভীর জ্ঞানের কথা শুনে তাঁর কাছ থেকে হাদিস শোনার জন্য তাঁকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠালেন। ইমাম বুখারি বললেন, "আমি হাদিসকে রাজ দরবারে নিয়ে অপমান করতে চাই না। তার প্রয়োজন হলে সে আমার ঘরে বা মসজিদে আসুক।" অতঃপর বাদশাহ তাঁকে বুখারা ত্যাগে বাধ্য করলে তিনি সমরকন্দে চলে যান।

স্মৃতিশক্তি

ইমাম বুখারি ছিলেন অগাধ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি যা দেখতেন বা শুনতেন তা তাঁর মনে থাকত। তাঁর বয়স যখন এগার তখন 'দাখেলি' নামক এক মুহাদ্দিস তাঁর সামনে হাদিস বর্ণনায় ভুল করলে তিনি তা শুদ্ধ করে দেন। উপস্থিত সবাই ইমাম বুখারির মেধা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন।

সমরকন্দের প্রসিদ্ধ চারশত হাদিসবিশারদ তাঁর হাদিস মুখস্থের পরীক্ষা নেন। তিনি তাতে অত্যন্ত সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলে সবাই তাঁকে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর ৯০ হাজারের উপরে ছাত্র ছিল যারা তাঁর কাছে হাদিস শিখেছেন।

যারা জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় ইমাম বুখারি তাদের জন্য এক অনুসরণীয় আদর্শ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে বুখারি শরিফ প্রণয়নে ইমাম বুখারির সাধনার একটি বিবরণ তৈরি করবে।

পাঠ ১১

ইমাম আবু হানিফা (র.)

ফিকাহ শাস্ত্রের জনক ইমাম আবু হানিফা (র.) ৮০ হিজরি ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম নুমান, উপনাম আবু হানিফা। তাঁর উপাধি হলো ইমাম আযম (বড় ইমাম)। পিতার নাম সাবিত। তিনি একজন তাবেঈ ছিলেন।

জ্ঞান সাধনা

ইমাম আবু হানিফা (র.) ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। প্রাথমিক জীবনে তিনি ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু কুফা নগরীর তৎকালীন আলেম-উলামার পরামর্শক্রমে তিনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। সতের বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করলেও তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যে হাদিস, তাফসির, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর শিক্ষক হযরত হাম্মাদ (র.)-এর নিকট একাধারে দশ বছর ফিকাহ বিষয়ের জ্ঞানার্জন করেন। এতে বোঝা যায়, জ্ঞানার্জনের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। কঠিন সাধনা থাকলে যে কোনো সময় জ্ঞানার্জন করা সম্ভব।

ফিকাহশাস্ত্রে অবদান

তিনি ফিকাহশাস্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন। তিনি তাঁর চল্লিশজন ছাত্রের সমন্বয়ে 'ফিকাহ সম্পাদনা বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ড দীর্ঘ বাইশ বছর কঠোর সাধনা করে ফিকাহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেন। পরবর্তীতে তিনি বোর্ডের চল্লিশজন সদস্য হতে দশজনকে নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করেন। ফিকাহশাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। কোনো মাসআলা (সমস্যা) এলেই এই বোর্ড তা নিয়ে গবেষণা করত এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে গবেষণা করে ফতোয়া (সমাধান) দিত। এভাবে কুতুবে হানাফিয়্যাতে (হানাফি মাযহাবের কিতাবসমূহ) ৮৩ হাজার মাসআলা ও সমাধান লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কঠিন বস্তুও যে সহজ করা যায় ইমাম আবু হানিফার 'ফিকাহ বোর্ড' এর প্রমাণ।

হাদিসশাস্ত্রে অবদান

ফিকাহশাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান থাকার কারণে হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অবদান তুলনামূলকভাবে কম মনে হয়। হাদিস শাস্ত্রে তিনি 'মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন, যাতে ৫০০ হাদিস রয়েছে।

গুণাবলি

ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, আবিদ ও বুদ্ধিমান। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ছাত্র ইয়াযিদ ইবনে হারুন বলেন, "আমি হাজার হাজার জ্ঞানী দেখেছি, তাঁদের বক্তব্য শুনেছি। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের মতো জ্ঞানী, খোদাভীরু ও ইলমে ফিকাহ-এ পারদর্শী কাউকে দেখিনি। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (র.) হচ্ছেন অন্যতম।" ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, "মানুষ ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মুখাপেক্ষী।"

ইমাম বুখারির প্রিয় শিক্ষক হযরত মক্কি ইবনে ইবরাহিম বলেন- "ইমাম আবু হানিফা তাঁর কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।" তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন যা চিন্তা করাও কঠিন। তিনি একাধারে ত্রিশ বছর রোযা রেখেছেন। চল্লিশ বছর যাবত রাতে ঘুমাননি। তিনি প্রতি রমযানে ৬১ বার কুরআন মজিদ খতম করতেন। তিনি মোট ৫৫ বার হজ করেন। তিনি এতই আল্লাহভীরু ছিলেন যে, কূফায় ছাগল চুরির কথা শুনার পর তিনি সাত বছর যাবত বাজার থেকে ছাগলের গোশত ক্রয় করেননি; এ ভয়ে যে এটি চুরিকৃত ঐ ছাগলের গোশত হতে পারে। তিনি বিনা পয়সায় জ্ঞান বিতরণ করতেন। কাপড় ব্যবসা করে জীবনযাপন করতেন। একদা কুফায় তিনি এক লোকের জানাযা পড়তে গেলেন। মাঠে প্রচণ্ড রোদ। সকলে বলল, দয়া করে আপনি ঐ বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়ান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন বৃক্ষটি কার। বলা হলো এটি আপনার অমুক ছাত্রের বাবার। তিনি বললেন, আমি ঐ বৃক্ষের ছায়ায় যাব না। কেননা ঐ ছাত্র মনে করতে পারে যে আমি তাকে শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে তার বাবার বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়িয়েছি। আদর্শ শিক্ষকের এক মহান দৃষ্টান্ত এটি।

বিচারকের দায়িত্ব পালনে অনীহা

তৎকালীন বাগদাদের খলিফা আল মানসুর ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। ফলে তাঁকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়। বলা হয় যে, এই মহান মনীষী ১৫০ হিজরি ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফার নির্দেশে প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার প্রভাবে ইন্তেকাল করেন। সরকার কর্তৃক দেওয়া সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে ইমাম আবু হানিফা নৈতিক ও দ্বীনি ইলমের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন। আমরাও জ্ঞানচর্চায় ও নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকব।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর অবদান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১২

ইমাম গাযালি (র.)

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল গাযালি (র.) ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি ৪৫০ হি: ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে 'তুস' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু হামিদ। পিতার নাম মুহাম্মদ আত্‌তুসি। তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সুফিবাদের উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য নৈতিক শিক্ষা যে কতখানি আবশ্যক তা তিনি তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেন। তিনি ইসলামি দর্শন ও সুফিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইহইয়াউ উলুমিদ্ দীন' (ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনর্জীবন)। প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি দর্শন ও শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' (ইসলামের দলিল) নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ১১১১ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি করতে চান, ইমাম গাযালি (র.) তাঁদের জন্য আদর্শ।

ইবনে জারির আত-তাবারি (র.)

তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু জাফর, পিতার নাম জারির। তিনি ৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তাবারিস্তানের আমুল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত মুফাসসির, আরব ঐতিহাসিক ও ইমাম ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসির (ব্যাখ্যা) করেন। ইতিহাস বিষয়েও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর তাফসির গ্রন্থটির নাম 'জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন'। আর ইতিহাস গ্রন্থটির নাম 'তারিখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক'। তাফসির ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর এ গ্রন্থ দুটি প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ। তিনি তাঁর তাফসির গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের তাফসির প্রণয়নে অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেন। তিনি তাফসির সম্পর্কীয় প্রচুর হাদিস সংগ্রহ করেন এবং হাদিসের আলোকে পবিত্র কুরআনের তাফসির প্রণয়ন করেন। এ কারণে তাঁর তাফসির গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক

গবেষণার জন্য এ তাফসির গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত। এভাবে তিনি ইতিহাস গ্রন্থে ধর্মীয় নীতি ও আইন সম্পর্কীয় বিষয়ে বহু বিবরণ উপস্থাপন করেন। তিনি ৯২৩ খ্রি. বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা ইমাম গাযালি (র.) ও ইবনে জারির আত তাবারি (র.)-এর গুণাবলির উপর দশটি বাক্য তৈরি করবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মুসলমানদের অবদান

শুধু সাধারণ শিক্ষায় নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায়ও মুসলমানগণ সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রচেষ্টা ও অবদানের উপর ভিত্তি করে মুসলমানগণ একসময়ে সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক শাখা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরই ফসল। এ সকল মুসলিম মনীষীর মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

পাঠ ১৩
চিকিৎসাশাস্ত্র

চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান। যাঁদের অবদানের কারণে চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আবু বকর আল রাযি, আল বিরুনি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযি

তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু বকর, পিতার নাম যাকারিয়া। তিনি আল-রাযি নামে পরিচিত। তিনি ৮৬৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি জুন্দেরশাহপুর ও বাগদাদে সরকারি চিকিৎসালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তৎকালে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে অনেক রোগী তাঁর নিকট আসতেন।

শল্যচিকিৎসায় আল রাযি ছিলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল গ্রীকদের থেকেও উন্নত। তিনি মোট দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শতাধিক হলো চিকিৎসা বিষয়ক। তিনি বসন্ত ও হাম রোগের উপর 'আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মৌলিকত্ব দেখে চিকিৎসা বিজ্ঞানের লোকেরা খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর আরেকটি গ্রন্থের নাম হলো আল মানসুরি। এটি ১০ খণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থ দুটি আল রাযিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অমর করে রেখেছে। তিনি হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। আল মানসুরি গ্রন্থে তিনি এনাটমি, ফিজিওলজি, ঔষধ, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, শল্যচিকিৎসা, বিষ, জ্বর ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি ৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

আল বিরুনি

বুরহানুল হক আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল বিরুনি সংক্ষেপে আল বিরুনি নামে পরিচিত। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিযমের নিকটবর্তী আল বিরুন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান গবেষক। তিনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী বড় দার্শনিক ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, পদার্থ, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। এ ছাড়া তিনি প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক পঞ্জিকাবিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষক ছিলেন। স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি, সাহসিকতা, নির্ভীক সমালোচনা ও সঠিক মতামতের জন্য তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি আল উসতাদ (মহামান্য শিক্ষক) নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ভূগোলের অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ণয় করেন। তাঁর লিখিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে 'আল-আছারুল বাকিয়্যাহ-আনিল কুরুনিল খালিয়্যাহ' গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে তিনি বর্ষপঞ্জি, গণিত, ভূগোল, আবহাওয়া বিজ্ঞান ও চিকিৎসাসহ নানা বিষয় বর্ণনা করেন। তিনি প্রথম প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তাঁর রচিত। তাঁর রচিত কিতাব আল-হিন্দ বা ভারততত্ত্ব এ উপমহাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ওপর লিখিত একটি আকর গ্রন্থ। তিনি ১০৪৮ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।

ইবনে সিনা

তাঁর পুরো নাম আবু আলি আল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি বুখারার নিকটবর্তী আফশানা নামক গ্রামে ৯৮০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। তিনি দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে 'আল-কানুন ফিত-তিবব' একটি অমর গ্রন্থ। ড. ওসলার এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে উল্লেখ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর সমপর্যায়ের কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না। আধুনিক বিশ্বেও তাঁর গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাঠদান করা হচ্ছে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্য রকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ বলা চলে। তিনি ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে রুশদ

তাঁর পুরো নাম আবু ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ। তিনি স্পেনের করডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগে মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। এই ক্ষণজন্মা পুরুষ শুধু এক বিষয়েই জ্ঞানী ছিলেন না, তিনি জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন। দর্শন, পদার্থ, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র- এ সকল শাখায় তাঁর সমান বিচরণ ছিল। তিনি এরিস্টটলের গ্রন্থসমূহ আরবিতে অনুবাদ করার পাশাপাশি নিজেও অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 'আল জামি'। এ গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও চিকিৎসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম হলো 'কুল্লিয়াত'। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সমাদৃত হয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মধ্যযুগের মুসলমানদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে অনেক ঋণী। মুসলমানদের ঐ অবদান না থাকলে আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞান এতদূর আসতে পারত না। আমরাও চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সহজতর করে তুলব।

পাঠ ১৪

রসায়নশাস্ত্র

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ন্যায় রসায়নশাস্ত্রেও মুসলমানদের অবদান অনেক। আল-কেমি (রসায়ন) শাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান, আল কিন্দি, জুননুন মিসরি, ইবনে আব্দুল মালিক আল-কাসি বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও অকৃত্রিম অবদানের ফলে রসায়নশাস্ত্র আজ উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছেছে।

জাবির ইবনে হাইয়ান

আবু আব্দুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান দক্ষিণ আরবের আযদ বংশে ৭২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাইয়ানও একজন চিকিৎসক ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ শেষে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কুফায় চিকিৎসা জীবন শুরু করলেও এর মধ্যে তিনি রসায়নশাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কুফায় একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে মৃত্যু পর্যন্ত (৮০৪ খ্রি.) সেখানেই গবেষণারত ছিলেন। রসায়নকে তিনি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রসায়ন ও বিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যথা পরিস্রবণ, দ্রবণ, ভস্মীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো প্রভৃতি তাঁরই আবিষ্কার। তিনি তাঁর গ্রন্থে ধাতুর শোধন, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া, লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ ও চুলের কলপ, লেখার কালি ও কাঁচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালি ও বিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নশাস্ত্রের পরিপূর্ণতা দান করেছেন বিধায় তাকে এ শাস্ত্রের 'জনক' বলা হয়। তিনি ৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

আল কিন্দি

আবু ইয়াকুব ইবনে ইছহাক আল কিন্দি ৮০১ খ্রি. কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইছহাক খলিফা মামুনের শাসনামলে কুফার গভর্নর ছিলেন। তিনি এরিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব (Theology of Aristotle) আরবিতে অনুবাদ করেন। খলিফা মামুনের সময়ে জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসেবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আল কিন্দি নিউপ্লেটোনিজমের উদ্ভাবক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্লেটো ও এরিস্টটলের মতবাদ সমন্বয় করার চেষ্টা করেন। তিনি অনধিক ৩৬৫টি গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর মতে গণিত ছাড়া দর্শনশাস্ত্র অসম্ভব। দর্শন ছাড়াও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও সংগীত বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মাতৃভাষা আরবি ছাড়াও পাহলবি, সংস্কৃত, গ্রিক ও সিরীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

জুননুন মিসরি

তাঁর নাম ছাওবান, পিতার নাম ইবরাহিম। তিনি জুননুন মিসরি নামে পরিচিত। তিনি মিসরের আখমিম নামক স্থানে ৭৯৬ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও আরব মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রের উপর যাঁরা প্রথমদিকে গবেষণা করেন তাঁদের অন্যতম। তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করেন। তাঁর লেখায় সোনা, রূপাসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি মিসরীয় সাংকেতিক বর্ণের মর্মার্থ বুঝাতেন। তিনি মিসরের আল জিজাহ্ নামক স্থানে ৮৫৯ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।

ইবনে আব্দুল মালিক আল কাসি

তাঁর নাম আবুল হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আল খারেজেমি আল কাসি। তিনি একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদেই অবস্থান করতেন। তাঁর লেখা 'আইনুস সানাহ্ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ্' (Essence of the Art and Aid of worker) এ গ্রন্থটি রসায়নশাস্ত্রে মূল্যবান একটি সংযোজন। তিনি এ গ্রন্থে রসায়নের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় শাখার সরল ও সহজ পন্থা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। যে সকল বস্তু 'সাদা' এবং যে সকল বস্তু 'লাল' এদের ব্যবহার ও পার্থক্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

পাঠ ১৫

ভূগোলশাস্ত্র

অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা এবং বিস্তৃত এলাকার লোকদের কেবলা নির্ধারণসহ নানা প্রয়োজনে মানচিত্রের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলাম প্রচারক ও বণিকগণের জন্য দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করার তাগিদে ভূগোলের জ্ঞান অর্জনের খুব প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল মোকাদ্দাসি, আল মাসুদি, ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইবনে খালদুনসহ অনেক মুসলিম মনীষী ভূগোলশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।

আল মোকাদ্দাসি

তাঁর নাম মুহাম্মদ, পিতার নাম আহমাদ। তিনি ৯৪৬ খ্রি. বাইতুল মোকাদ্দাস এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন তাই আল মোকাদ্দাসি নামে পরিচিত। তিনি একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি স্পেন, ভারতবর্ষ ও সিজিস্তান ব্যতীত সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেন। দীর্ঘ বিশ বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ৯৮৫ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম হলো 'আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতুল আকালিম'। এই মনীষী ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

আল-মাসুদি

তাঁর নাম আবুল হাসান আলি বিন হুসাইন আল-মাসুদি। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে পরিব্রাজক, ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক 'ভূগোল বিশ্বকোষ'-এ তাঁর

ভ্রমণসমূহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন। পৃথিবীর আকার, আয়তন, গতি ও প্রধান প্রধান বিভাগগুলোর বিবরণ দেন। ভারত মহাসাগর, পারস্য সাগর, আরব সাগরের ঝড়ের অবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেন। ৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভূকম্পন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে ইন্তেকাল করেন।

ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ

ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ আল হামাবি পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'মুজামুল বুলদান' নামক গ্রন্থখানি ভূগোলশাস্ত্রের এক প্রামাণ্যগ্রন্থ। এতে তিনি প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয় ও ঘটনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে খালদুন

তাঁর নাম আব্দুর রহমান, পিতার নাম মুহাম্মদ। তিনি ইবনে খালদুন নামে পরিচিত। তিনি ১৩৩২ খ্রি. তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাব আল-ইবার ওয়া দিওয়ান আল-মুবতাদা ওয়াল খাবার ফি-আইয়াম আল-আরাব ওয়াল আযম ওয়া বারবার' এটি সংক্ষেপে আল মুকাদ্দিমা নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে ভূগোল বিষয়ে তিনি যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন তা তাঁকে ভূগোলশাস্ত্রে অমরত্ব দান করেছে। তিনি ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

পাঠ ১৬

গণিতশাস্ত্র

গণিতকে বিজ্ঞানের মূল বলা হয়ে থাকে। এই গণিতশাস্ত্র আবিষ্কারের অগ্রগতি ও উন্নতির উৎকর্ষসাধনে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আল-খাওয়ারিযমি, ইবনে হায়সাম, উমর খৈয়াম ও নাসির উদ্দিন তুসিসহ অনেক মুসলিম মনীষী এ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিযমি

তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিযমি। ৭৮০ খ্রি. খাওয়ারিযম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গণিতশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁকে গণিতশাস্ত্রের 'জনক' বলা হয়। বীজগণিতের আবিষ্কারক হলেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর রচিত 'হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালাহ' গ্রন্থের নামানুসারে এ শাস্ত্রকে পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা আল-জেবরা নামকরণ করে। তিনি এ গ্রন্থে আট শতাধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত করেন। সমীকরণের সমাধান করার ছয়টি নিয়ম তিনি আবিষ্কার করেন। এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পঠিত হতো। 'কিতাবুল হিসাব আল আদাদ আল হিন্দী' তাঁর পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর গণিতশাস্ত্র দ্বারা উমর খৈয়াম,

লিওনার্ডো, ফিরোনাসসি এবং মাস্টার জ্যাকবসহ আরও অনেকেই প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তিনি ৮৫০ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।

হাসান ইবনে হায়সাম

হাসান ইবনে হায়সাম একজন চক্ষুবিজ্ঞানী (Optic Scientist) ছিলেন। তিনি ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। চক্ষুবিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ 'কিতাবুল মানাযির' তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। মধ্যযুগে আলোক বিজ্ঞানের এটি একমাত্র গ্রন্থ ছিল। গবেষক রোজার বেকন, লিউনার্ডো, কেপলার প্রমুখ এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই তাঁদের গবেষণা করেন। তিনি দৃষ্টি শক্তির প্রতিসরণ ও প্রতিফলন বিষয়ে গ্রিকদের ভুল ধারণা খণ্ডন করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বাহ্যপদার্থ থেকেই আমাদের চোখে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়। চোখ থেকে বের হওয়া আলো বাহ্যপদার্থকে দৃষ্টিগোচর করায় না। তিনিই ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিষ্কার করেন।

আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা গতি বিজ্ঞানকে তাদের আবিষ্কার বলে দাবি করলেও ইবনে হায়সাম এ বিষয়ে বহু পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন। বায়ুমণ্ডলের ওজন, চাপ এবং তাপের কারণে জড়পদার্থের ওজনেও তারতম্য ঘটে। মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে বর্ণনা করেছেন। স্যার আইজ্যাক নিউটনকে (১৬৪২-১৭১৭ খ্রি) মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত শক্তির আবিষ্কারক মনে করা হলেও ইবনে হায়সাম এ বিষয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনি ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

উমর খৈয়াম

তাঁর নাম উমর ইবনে ইবরাহিম আল খৈয়াম সংক্ষেপে উমর খৈয়াম। ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির গণিতবিদ। তাঁর 'কিতাবুল জিবার ওয়াল মুকাবালা' গণিতশাস্ত্রের একখানি অমর গ্রন্থ। ঘন সমীকরণ এবং অন্যান্য উন্নতশ্রেণির সমীকরণের পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং সংজ্ঞানুসারে এগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করে উমর খৈয়াম বীজগণিতের অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেন। এ ব্যাপারে তিনি গ্রিকদের থেকেও বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপরও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১১২২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

নাসির উদ্দিন তুসি

মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন তুসি ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে মোট ষোলটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ত্রিকোণমিতিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান হতে পৃথক করে সমতল এবং গোলাকৃৎ ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। গণিতশাস্ত্র বিষয়ে প্রণীত তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে- মুতাওয়াসিতাত বাইনাল হান্দাসা ওয়াল হাইয়া (The Middle Books between Geometry and Astronomy), জামিউল হিসাব বিত তাখতে ওয়াত্তোরাব (Summary of the Whole of Computation with Table and Earth), কাওয়ায়েদুল হান্দাসা, তাহরিরুল উসুল অন্যতম। তিনি ১২৭৪ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।

আমরা এসব মুসলিম মনীষীর ন্যায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার চেষ্টা করব। সেই অনুযায়ী জীবন গড়ব এবং দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব' গ্রন্থটির প্রণেতা কে?

ক. আল বিরুনি খ. ইবনে সিনা

গ. আল রাযি ঘ. ইবনে রুশদ।

২. খলিফা আল-মানসুর কাকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

ক. ইমাম গাযালি (র.) খ. ইমাম শাফি (র.)

গ. ইমাম বুখারি (র.) ঘ. ইমাম আবু হানিফা (র.)

৩. ন্যায়বিচার বলতে বোঝায়–

i. আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা

ii. গণ্যমান্যদের সম্মান প্রদর্শন করা

iii. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

হাফিজ সাহেবের সন্তান যায়েদ বন্ধুদের সাথে মিলে খালেদকে প্রহার করে। খালেদ যায়েদের পিতার কাছে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি তাঁর সন্তানকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেন।

৪. হাফিজ সাহেবের কাজের মাধ্যমে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে ?

ক. হযরত আবু বকর (রা.) খ. হযরত উমর (রা.)

গ. হযরত উসমান (রা.) ঘ. হযরত আলি (রা.)

৫. হাফিজ সাহেবের বিচারের ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে–

i. ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হবে

ii. শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকবে

iii. প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সামাজিক প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে জনাব সিহাব চৌধুরী লোকমান সাহেবকে মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। কিছুদিন পর লোকমান সাহেব প্রতিশোধ নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও এ থেকে বিরত থাকেন। এ ধরনের উদারতা দেখে জনাব সিহাব চৌধুরীর মধ্যে বেশ পরিবর্তন আসে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোনো মানুষের সাথে আর অন্যায় আচরণ করবেন না। গোত্র-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। সকল কাজকর্মে কুরআন ও হাদিসকে অনুকরণ করে চলবেন।

ক. মদিনা সনদের ধারা কয়টি?

খ. রাসুলের জীবনাদর্শ অনুকরণীয় কেন?

গ. লোকমান সাহেবের আচরণে মহানবি (স.)-এর কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সিহাব সাহেবের পরিবর্তন বিদায় হজের ভাষণের আলোকে পর্যালোচনা কর।

২. জামিল সাহেব টঙ্গী এলাকার একজন শিল্পপতি। তিনি এলাকার মানুষের পানির তীব্র সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি পানির পাম্প স্থাপন করেন। এ ছাড়া এলাকায় মুসল্লিদের তুলনায় মসজিদ ছোট হওয়ায় তা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সহধর্মিণী মিসেস নাবিলা নিয়মিত সালাত আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সংসারের সকল কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করেন।

ক. কোন সাহাবি তাবুক যুদ্ধে সকল সম্পদ ব্যয় করেছিলেন?

খ. 'হযরত উমর (রা.) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক'– বুঝিয়ে লেখ।

গ. মিসেস নাবিলার কাজের মাধ্যমে কোন মহীয়সী নারীর আদর্শের সাথে মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জামিল সাহেবের কার্যক্রম হযরত উসমান (রা.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : ইসলাম শিক্ষা

যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করো
তখন ইনসাফের সাথে বিচার করো।
—আল কুরআন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।